গোপন কথা

জর্জ জিয়াউদ্দিন হায়দার

হ্যালো, হ্যালো, কে? আম্মা?

হ্যা, কেমন আছিস বাবা?

আসসালামু আলাইকুম, ভালো, আপনি?

ভালো। মন্টুর মা উত্তর দেন।

মন্টু আমেরিকাতে প্রায় পনেরো বছর ধরে আছে। মন্টুর বয়স ৩৫। কিন্তু দেখতে মনে হবে ২৫। সুদর্শন, আকর্ষণীয়। মাঝারি গড়ন। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা।

মন্টু আমেরিকায় ইউনিভার্সিটি অফ রোড আইল্যান্ড থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছে ইংরেজিতে ২০০০ সালে। তারপর আরো তিন বছর। ম্যাসাচুসেটস স্কুল অফ ল'-তে গিয়ে ল' ডিগ্রি নিয়েছে ২০০৪ সালে। মন্টু বর্তমানে আইনজীবী হয়ে রোড আইল্যান্ডের ল' ফার্মে কাজ করছে।

দেশে আসছিস কবে? মন্টুর মা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

নেক্সট সামারে। মন্টু উত্তরে বলে।

বিয়েশাদি করতে হবে এখন। আমরা মেয়ে ঠিক করে রেখেছি। মন্টুর মা জানান।

না, না, না। বিয়ে করবো না। মন্টু প্রতিবাদ করে।

কেন?

না, দরকার নেই। শুধু শুধু মেয়ে দেখবেন না। মন্টু জোরালো স্বরে বললো।

মন্টু এই প্রথমবার দেশে যাচ্ছে পনেরো বছর পর। আমেরিকাতে এসেছিল বিশ বছর বয়সে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর। গৃন কার্ড হয়েছে মাত্র গত মাসে।

কেন? এটা একটা কথা হলো? তুই বিয়ে করবি না? ৩৫ বছর বয়স? মন্টুর মা জিজ্ঞাসা করলেন।

আমেরিকাতে প্রচুর ঠাণ্ডা। মন্টু যে রাষ্ট্রে থাকে তার নাম হচ্ছে রোড আইল্যান্ড। প্রচুর বরফ পড়ছে রোড আইল্যান্ডে। মন্টু জানালার পাশে দাড়িয়ে ফোনে ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল।

পুরো শহরটা বরফে ঢেকে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে বাইরে শোনা যাচ্ছে।

মন্টুর মা-বাবা প্রচুর অর্থশালী। ওদের গার্মেন্টসের ব্যবসা আছে। মন্টুর দুই বোন এবং এক ভাই। মন্টুর এক বোন হঠাৎ করে মারা যায়।

না, আম্মা। আমি বিয়ে করবো না। কারণ...।

মন্টুর মা কথা কেড়ে নেয়। কারণ? কারণ কি? তুই কি বিয়ে করে ফেলেছিস? মা অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

না, না, না, তা নয়... আমি...।

আ-মি, মন্টুর কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে।

ধীরে ধীরে মন্টুর দুই চোখ পানিতে ভরে যায়।

রোড আইল্যান্ডে বরফ ঝড় হচ্ছে। ফালি ফালি বরফগুলো অবিরত পড়ছে, সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া।

আম্মা, আম্মা, আমি আপনাকে একটা কথা অনেক দিন বলবো বলবো করে বলিনি। মন্টু গম্ভীর স্বরে বললো।

মা চুপ করে থাকেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক। তিনি সারা জীবন ত্যাগ করেছেন ছেলেমেয়ে এবং মন্টুর বাবার জন্য।

আমি শুধু শুধু বিয়ে করে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে চাই না। মন্টু বললো।

কেন? মা জানতে চান।

কারণ আমি মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট নই। আমি, আ--মি, Gay (গে)। মন্টু জানালো।

এটা আবার কি? মা জিজ্ঞাসা করেন।

গে হচ্ছে যারা... মন্টু শেষ করতে পারে না।

মন্টু কিভাবে মাকে বলবে নিজের সম্পর্কে? কিভাবে জানাবে সেই গোপন কথা যেটা অঙ্কুরিত হয়েছিল দেশে এবং বিস্তারিত হয়েছিল বিদেশে।

মন্টু শিশুকাল থেকেই সমকামী। শৈশব থেকেই পুরুষের সৌন্দর্যে মন্টু আসক্ত। মন্টু যখন ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেলের হস্টেলে থাকতো তখন ওর প্রণয় ছিল ছেলেদের সঙ্গে।

তারপর আমেরিকা এসে মন্টু নিজেকে আবার আবিষ্কার করে। আমেরিকার সমাজ পর্যন্ত সমকামিতা গ্রহণ করে না পুরোপুরিভাবে। তাই মন্টু এতোগুলো বছর ব্যাপারটা চেপে রেখেছিল।

মন্টু ওর মায়ের মতোই ধার্মিক। মন্টু বিদেশে থেকেও পাচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়েনি। কোনোদিন মদ, সিগারেট স্পর্শ করেনি। খোদা ছাড়া কিছু বোঝে না।

এটা মন্টুর জন্য খুবই কঠিন। একদিকে ধর্ম, আরেকদিকে মন্টুর নিজস্বতা। মন্টু কোনোদিন সমকামী হতে চায়নি। কিন্তু মন্টু হচ্ছে মন্টু। এটা মন্টুর সত্তা (Being)। মন্টু অস্বীকার করতে পারেনি মন্টুর নিজস্ব সত্তাকে। তাই মন্টু খোদার কাছে ক্ষমা চেয়েছে বার বার।

মানে, মানে, আমি ছেলেদের পছন্দ করি। আমার প্রেমিক আছে। সে হচ্ছে আমেরিকান ছেলে। ওর সঙ্গে গত দশ বছর ধরে আছি। মন্টু দ্রুত শেষ করে। আমি ওকে ভালোবাসি। মন্টু বললো।

মন্টুর মা চুপ করে থাকেন।

রোড আইল্যান্ডে বরফ ঝড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। দমকা হাওয়া হু হু করে বাইরে বইছে।

রোড আইল্যান্ড, আমেরিকা থেকে

রিক্সাওয়ালা

নবী

আমার বাড়ি নোয়াখালী। জীবন ও যীবিকার প্রয়োজনে আমি রংপুরে থাকি। যাই হোক আমি আমার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমার আম্মার সাথে দেখা করার জন্য। বাড়ি থেকে রংপুর যাবার জন্য আমার এক বন্ধুকে নিয়ে ফেনী যাই টিকেট কাটার জন্য। টিকেট কাটার পর আমি আর আমার বন্ধু ছবি দেখার জন্য সিনেমা হলে যাব এর জন্য একটা ইয়াংন রিক্স ড্রাইভারকে ডাকি। আমার আবার বদ অভ্যাশ হচ্ছে রিক্স ড্রাইভারের সাথে আলাপ করা। আমি তার বাড়ি কোথায় বলতে সে বলে তার বাড়ি বগুড়া।

তারপর আমার মাথায় শয়তানী বুদ্ধি আশায় আমি তাকে বলি, তুই কোন দিন কোন মেয়েকে খাইছতিতি। তারপর সে প্রথমে অস্বিকার করলেও পরে স্বিকার করে। আমি এই কথা রিক্স ড্রাইভারকে জ্ঞিগেশা করায় আমার বন্ধু খুবই লজ্জা পায় এবং আমাকে বাধা দেবার চেষ্ঠা করে।

তারপর আমি ভালভাবে রিক্স ড্রাইভারকে জ্ঞিগাশা করলে সে যা বললো তা হলো,

তার বাড়ি সামনের বাড়ির একটা সুন্দর মেয়ে ক্লাশ টেনে পড়ত। এই মেয়েটা একটা ছেলেকে খুবই ভালবাসত। তাই এই মেয়েটা এই রিক্স ড্রাইভারের মাধ্যমে ছেলেটার কাছে তার ভালবাসার চিঠি পাঠাত এবং ছেলেটাও তার প্রতি উত্তরে চিঠি পাঠাত এই রিক্স ড্রাইভারের মাধ্যমে। এই ফাঁকে এই মেয়েটা এই রিক্স ড্রাইভারের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার নেয়। টাকার পরিমাণ কত তা অবশ্য সে আমাকে বলেনি। তারপর রিক্সর ড্রাইভার তার টাকা চাইলে সে কিছু বলত না। একদিন এই রিক্স ড্রাইভার শাহস করে বললো আমার টাকা না দিলে আমার সাথে এক রাত থাকতে হবে। মেয়েটা প্রথমে কিছু না বললেও একটা হাসি দিয়েছিল। তারপর মেয়েটা বললো একদিন রাতে আশিও। তারপর এই রিক্স ড্রাইভার সেই রাতেই মেয়েটার বাসায় যায় রাত দশটার পর। এরপর মেয়েটা তাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তার শরীরের সব জামা কাপড় খুলে ফেলে দেয়। এই রিক্স ড্রাইভার তারপর তিন তিন বার এই ক্লাশ টেনে পড়া

মেয়েটার সাথে মিলিত হয়। মিলিত হবার পর ভোর রাত্রে এই রিক্স ড্রাইভার যাবার সময় আরো তিনশত টাকা দিয়ে চলে যায়।

এখন আমার প্রশ্ন হলো যায় যায় দিন এর পাঠকদের কাছে, এই মেয়েটা কিভাবে একটা রিক্স ড্রাইভারের সাথে মিলিত হতে পারে? সে কিনা তার বাড়ির কাজের ছেলেরও যোগ্য না। হাইরে ভালবাসা যে কিনা সামান্য ভালবাসার চিঠি আদান প্রদানের জন্য একটা রিক্স ড্রাইভারের সাথে মিলিত হতে পারে তার ভালবাসার কথা আর নাই বা বললাম।

রংপুর থেকে

এই রচনাটি হুবহু ছাপা হলো। –যাযাদি

টুর

মোহাম্মদ ওমর ফারুক

কলেজ থেকে (Holborn) স্টাডি টুরে আমরা ৩৫জন দেশি–বিদেশি ছাত্রছাত্রী বেলজিয়ামে গিয়েছিলাম ১৫ এপ্রিল ২০০৫–এ। ইওরোস্টারের ভ্রমণ ভালোই লেগেছে, এ অর্থে জীবনে প্রথম ট্রেনে চেপে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া, তাও আবার ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে। যে চ্যানেল ব্রজেন দাস সাতরে পার হয়ে আমাদের বাঙালির বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন বহু আগে সেই চ্যানেলের নিচ দিয়ে আমরা পার হয়েছি ইউকে থেকে অন্য দেশে, বড়ই চার্মিং ব্যাপার কিন্তু যখন সুড়ঙ্গ পার হই তখন সুড়ঙ্গের কিছুই নজরে আসেনি। বার বার জানালায় চোখ রেখে নিজের প্রতিবিম্ব ওই জানালার গ্লাসে দেখছিলাম। যাওয়ার সময় বন্ধু সাদেক আবদুল্লাহ বললো, বেলজিয়ামে আমার এক বৌদি থাকেন তিনি খুবই ভালো মানুষ। দাদাও। দাদা এবং বৌদির গল্প করে বললো, তাদের ওখানে আমরা যাবো।

আমি বললাম ভালোই, তাদের থেকে গাইড নিয়ে বেলজিয়ামের আকর্ষণীয় স্থান অল্প সময় দেখা যাবে।

বেলজিয়ামে আমরা বেলা ১২টায় পৌছলাম। হোটেলে পৌছাতেই হোটেল ম্যানেজার বললো আমরা তিনটার আগে রুমে উঠতে পারবো না, ততোক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মেজাজ খারাপ হলো, কলেজ কর্তৃপক্ষকে মনে মনে গালমন্দ করলাম। বন্ধু সাদেক আবদুল্লাহ যথারীতি তার বৌদি ও দাদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নিল এবং তারা আমাদের নিতে আসছেন বলে জানালো। আমরা হোটেলে আসাদের অবস্থানের ইনফরমেশন রেখে দুপুরের খাবার খেতে বের হলাম। খাবারের দোকান খোজ করতেই আবিষ্কার করলাম আজানের ধ্বনি। একটা খাবার দোকান থেকে আসা আজানের ধ্বনি আমাদের খুবই আকৃষ্ট করলো। (আমি, সাদেক, লিটন, আশরাফ, বিপ্লব, রুমা, ফাহমিদ) সবাই ওই দোকানে প্রবেশ করে হালাল খাবারের অর্ডার দিলাম। সবাই মিলে মজা করে সেই টার্কিশ খাবার খেলাম। টার্কিশ খাবারের ভিন্ন স্বাদ ভিন্ন আমেজে খেলাম। সবচেয়ে ভালো লেগেছে তাদের মিন্ট চা। সত্যি অপূর্ব। খাবারের বিল বিপ্লব বড়ুয়ার জীবন বন্ধু রুমা বড়ুয়াই পরিশোধ করলো।

হোটেলে এসে দেখি সাদেক আবদুল্লাহর দাদা বিধানদা এবং দাদার মেয়ে স্বর্ণা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দাদার ডান হাত অপারেশন করায় সেই হাতে ব্যান্ডেজ করা। আমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ব্যাগগুলো হোটেলের রুমে রেখে দাদার সঙ্গে যাত্রা করলাম। ওইদিন কলেজের কোনো শেডিউল না থাকায় আমরা বাংলাদেশি দাদা এবং দাদার মেয়েকে গাইড মেনে নয়জন ব্রাসেলস শহর দর্শনে বের হলাম। শুরু থেকেই বাবা–মেয়েকে খুবই আন্তরিক মনে হলো। মেয়ে স্বর্ণার পায়ে ব্যথা, বাবার হাত ভাঙা এ অবস্থায় আমাদের নিয়ে তারা ব্রাসেলস–এ অবস্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিস, ইওরোপের বড় মার্কেট, ডায়মন্ড মার্কেট দেখাতে লাগলেন। যতোই তাদের সঙ্গে সময় পার করছি ততোই মায়া–মমতা ভালোবাসার গতি ইওরোস্টার থেকেও দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগলো।

ইতিমধ্যে দাদা বাসায় ফোন করে আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। রাত দশটার কাছাকাছি আমরা দাদার বাসার উদ্দেশে রওনা হই। বাসার কাছে যেতেই বারান্দায় বৌদিকে দেখতে পাই। আমাদের অপেক্ষায় বৌদি অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় বসেছিলেন। কাছে যেতেই চমৎকার হাসি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। অনিন্দ্য সুন্দর হাসি এবং অভ্যর্থনায় মনে হলো বৌদির প্রিয় কোনো মেহমান দীর্ঘদিন পর তার বাড়িতে এসেছেন।

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই খাবার পরিবেশন করা হলো। সবজি, ডাল, ইলিশ মাছ, মুরগির মাংস, ছোট মাছ সবই ছিল খাবারের মেনুতে। সব আইটেম এতো মজা হয়েছে যে সব কিছুই প্রশংসার দাবি রাখে। এমন স্বাদের ডাল রান্না জীবনে খুব কম খেয়েছি। অবশ্য আমার এক নানু ডাল রান্নার জন্য বিখ্যাত ছিল। সবাই খুব তৃপ্তি নিয়ে খাবার সাবাড় করলাম। এরই মধ্যে বৌদি আরেকদিনের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমরা সবাই তার কষ্টের কথা ভেবে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি বললেন নিমন্ত্রণ না গ্রহণ করলে তিনি বুঝবেন, খাবার খারাপ হয়েছে।

যাহোক পরে আধা সম্মতি দিয়ে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশে। দাদা এবং দাদার ছয় বছরের ছেলে দ্বীপ আমাদের হোটেলে পৌছে দিল। এতো কষ্টের পরও অসুস্থ দাদা একটুও বিরক্ত হননি বরং তার উৎসাহ আমাদের নিয়ে বেড়েই চললো। দাদা একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। অনেক জ্ঞান রাখেন দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে। অল্প আলোচনায় তাকে একজন দেশপ্রেমিক মনে হলো।

এক সময় আবিষ্কার করলাম তিনি ইওরোপ আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তবে আওয়ামী লীগের সাফাই গেয়ে কোনো কথা বলেননি। তার একটা কথা খুব মনে ধরলো। তিনি বললেন, কিছুদিন আগে শেখ হাসিনা ইওরোপিয়ান পার্লামেন্টে এসে দেশের বারোটা বাজিয়েছেন।

আমি বললাম, কিভাবে?

তিনি বললেন, সরকারে তালেবান আছে জঙ্গিরা দেশ চালায় এসব কথায় আমাদের খুবই ক্ষতি হয়েছে। আমি অবাক হলাম তার এই মন্তব্যে কারণ আমরা বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করি তারা দলের বাইরে যেতে পারি না, নেতা নেত্রীর বাইরে যেতে পারি না। নেতা নেত্রীরা যাই বলুক না কেন তাই বেদবাক্য অবশ্য পালনীয় বলে মনে করি এবং তাদের কাজকে শর্তহীন সমর্থন দিই। আমরা সাধারণত এক দলের বিরুদ্ধে অন্য দলের বিদ্বেষ ঘটাই খুবই বিশ্রীভাবে। দাদাকে তার ব্যতিক্রম পেলাম। দাদা আক্ষেপ করে বলেছেন, যেদিনই ইউ পাসপোর্ট পেয়েছি সেদিন কষ্ট পেয়েছি। আমি অবাক হয়ে বললাম এ তো খুশির কথা – আপনি ভালো থাকবেন আপনার জেনারেশন ভালো থাকবে। তিনি বললেন, আমি আমার প্রিয় সবুজ পাসপোর্ট বিসর্জন দিলাম। এ যে কতো বেদনার, আপনি বুঝবেন না। এখনো দেশে চলে যেতে ইচ্ছা করে। আমার সন্তানরা হয়তো প্রিয় দেশে আর যাবে না। তাদের কাছে প্রিয় বাংলাদেশ ধূসর স্মৃতি হয়ে থাকবে, ভাবতেই কষ্ট হয়।

আমি তার চোখের পানে চেয়ে দেখলাম কষ্টের নোনা জল টলমল করছে। কথা বাড়ালাম না। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, কবে আমাদের দেশের সব দল মিলে ন্যাশনাল ক্রাইসিস মোকাবেলা করবে। কবে এক দল অন্য দলের প্রতি নিন্দা বিদ্বেষ করবে না। সেদিন কবে আসবে দাদা? আমি উত্তর দিতে পারিনি।

সারা দিন দাদার আতিথেয়তার কথা মনে করে ঘুমিয়ে পড়েছি। পরদিন শেডিউল করা প্রোগ্রামের ব্রুস শহরে গেলাম। হাজার বছরের পুরনো শহর ঘুরে দিন পার করে দিলাম। রাজধানী থেকে দেড় ঘণ্টার বাস জার্নি ভালোই লেগেছে। শুধু বৈরী আবহাওয়া আমাদের আনন্দের মাঝে বাধা হয়েছে। রাতে বিমানবালা রুমা তার ভ্রাম্যমাণ চুলোর ভাত, মাংস, ডাল রান্না করে খাইয়েছে। রাতের সেই আড্ডা খুবই প্রাণবন্ত ছিল। সবার অতীত জীবন, ইউনিভার্সিটি, কলেজ জীবনের ঘটনা স্থান পেয়েছে সেই আড্ডায়। যাহোক পরের দিন সে অন্যরকম ভালোবাসার ঘরে আবার নিমন্ত্রণে গেলাম। গত দিনের চেয়েও মজার মজার আইটেমে সাজানো খাবার খেলাম। এরপরও বৌদিকে অতৃপ্ত পেলাম। বৌদি বললেন, কতো কিছু করা উচিত ছিল। তিনি তা করতে পারেননি। অথচ আমরা ঋণী হয়ে গেলাম দাদা–বৌদির কাছে।

বৌদি এবং দাদা এলাকায় সক্রিয় রাজনীতি করতেন। রাজনীতিই হয়তো মানুষকে অন্যরকম ভালোবাসা শেখায়। সেই ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিকেল চারটায় লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিই।

লন্ডন থেকে
farouqmz@yahoo.com

জাত

সাহাদাত আলী

ইংল্যান্ডে সিলেটি কমিউনিটিতে বেশ কিছু জোকস প্রচলিত। এ রকম দুটি জোকস হলো : *ফগা* আর *শয়তান* বিষয়ক।

ফগা হলো আহম্মকের সিলেটি ভার্সন। *ফগা* বলা হয় মৌলভীবাজারীদের। আমরা মৌলভীবাজারীরা নাকি অনেক আগে কোনো এক মুচি ভদ্রলোককে ইউপি চেয়ারম্যান বানিয়েছিলাম। এ জন্য আমরা *ফগা*। রসিক মহাজনরা মানতে নারাজ সেই মুচি ভদ্রলোককে নির্বাচিত করে আমরা কোনো ভুল করিনি বরং অনাধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মুক্ত সমাজেরই অনুশীলন করেছিলাম মাত্র!

দ্বিতীয় জোকসটি হলো *শয়তান* সংক্রান্ত। শয়তান বলা হয় বিয়ানীবাজারীদের। এরা নাকি এতো ধূর্ত ও স্বার্থপর যে, শয়তানের সঙ্গেই তাদের তুলনা চলে! রসিকজনের আক্ষেপ হলো আল্লাহতাআলা বিয়ানীবাজারীই যদি তৈরি করলেন তো এতো কষ্ট করে আবার শয়তান তৈরি করতে গেলেন কেন!

রাজিয়াকে বললাম, জোকস অনুসারে আমি ফগা, তুমি শয়তান। সে বললো, এসব ননসেন্স, ডোন্ট বি প্রেজুডিসড। বিশ্বাস করলাম, তাকে সংস্কারমুক্ত জেনে বেশ খুশি হয়েছিলাম। জানি না ভুল করেছিলাম কি না।

রাজিয়ার বাড়ি বিয়ানীবাজার। থাকে লন্ডনে। তার সঙ্গে আমার প্রেম হয় ইন্টারনেটের কল্যাণে। Shaadi.com (শাদি ডট কম)–এ আমার প্রোফাইল সাবমিট করার কিছুদিন পর মেইল চেক করতে গিয়ে তার পর পর তিনটি মেইল পাই। প্রথম মেইলটা ছিল *হাই* আমি আপনার প্রোফাইল ভিজিট করেছি। WRITE-UP খুব ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ। আপনার মধ্যে অনেক মিল খুজে পেয়েছি। তাই আপনাকে আরো জানতে চাই। মেইল করলে খুশি হবো।

প্রথম মেইলের অপেক্ষায় লেখা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেইলটি ছিল–

কি ব্যাপার এখনো লিখলেন না যে! আগ্রহী নন? দেখুন, এখানে আমি আপনার সময় নষ্ট করতে আসিনি। বিয়ের ব্যাপারে আসলেই আমি সিরিয়াস। আর আপনার মতো আমিও সিলেটি এবং লন্ডনেই থাকি। সুতরাং অপেক্ষায় রইলাম।

মেইলগুলো পড়ে তার প্রোফাইল দেখলাম, হ্যা তাই তো, তার সঙ্গে আমার বেশ মিল! এখনো আমার ব্যাপারে আগ্রহী কি না জানাতে বললাম।

মেইল পেয়ে সে বেশ খুশি হলো আর আমার সম্পর্কে আরো জানতে চাইলো।

ফিরতি মেইলে আমার শিক্ষা, রুচি, মূল্যবোধ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা প্রভৃতি বললাম আর তার প্রোফাইলে উল্লিখিত ফিজিকালি চ্যালেঞ্জটা কি জানতে চাইলাম।

সমস্যার বিবরণ দিয়ে সে লিখলো, ছোটবেলায় টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় তার একটি পা অপর পা থেকে খানিকটা সরু। তাই সে খুড়িয়ে হাটে। শারীরিক সমস্যার জন্য তার প্রতি মানুষের আচরণে জীবনের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ। বিয়ের অনেক প্রস্তাব এলেও শারীরিক অপূর্ণতার কারণে শেষ মুহূর্তে সবাই সরে দাড়ায়। সে মনে করে, বিয়ে করা বুঝি তার হলো না আর। তাকে নিয়ে, বিশেষত তার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার ফ্যামিলিতে এক ধরনের শোকাবহ পরিবেশ বিরাজমান।

বিয়েকে কেন্দ্র করে জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা, বিয়ের প্রতি হতাশা, তার প্রতি মানুষের আচরণ সর্বোপরি তাকে ঘিরে পরিবারের সবার উদ্বেগ প্রভৃতি শুনে তার জন্য আমার কেমন যেন মায়া হলো।

লিখলাম, জানি তোমাকে অফার করার মতো আহামরি তেমন কিছু আমার নেই। মানুষ হিসেবে আমি খুবই সাধারণ। দর্শনে সাধারণ, গুণপনায়ও সাধারণ। তুমি চাইলে আর আমি তোমার টাইপের পুরুষ হয়ে থাকলে আমার সকল সাধারণত্ব নিয়েই তোমার পাশে দাড়াতে চাই।

আমি তাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছি বলে অত্যন্ত আনন্দিত হলো, আমাকে এপৃশিয়েট করলো।

তার বাড়ি বিয়ানীবাজার থানার জলঢুপ এলাকার মোল্লাগ্রামে। আমার মৌলভীবাজার সদর থানার ফতেপুরে। লন্ডনে সে থাকে হাইবেরি-তে আমি অল্ডগেইট ইস্ট লন্ডনে। তার বাবা প্রয়াত। আমার বাবা জীবিত, ব্যবসায়ী। তার মা, আমার মা দুজনেই গৃহিণী। দুভাই দুবোনের ছোট সংসার তার আর সাত ভাই তিন বোনের বিশাল একান্নবর্তী পরিবার আমার। আমি পড়ি DBS-এ। সে গিল্ড হল-এর মরগেইট ক্যাম্পাসে। মডারেট মুসলিম ফ্যামিলি আমার।

এ রকম তথ্য বিনিময়ের এক পর্যায়ে সে জানতে চায় আমার জাত কি? বংশকে সিলেটে জাত বলা হয়।

সিলেটি সমাজে জাত প্রথা একটা জঘন্য সমস্যা। মোল্লা-মৌলভী থেকে শুরু করে শিক্ষিত অথচ কুসংস্কার আচ্ছন্ন অনেক লোকও এই প্রথায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে জাত বিষয়টা আল্লাহ প্রদত্ত।

তবে হাস্যকর ব্যাপার হলো, লন্ডনি ছেলের সঙ্গে দেশি মেয়ের বিয়েতে বা লন্ডনি মেয়ের সঙ্গে দেশি ছেলের বিয়েতে জাত বিষয়টা তারা সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে যায়। উপরন্তু মাইক্রো, কার থেকে শুরু করে দামি যৌতুক অফার করতে থাকবে।

তার মুখে টিপিকাল সিলেটি প্রশ্নটা শুনে অবাক হলাম। বললাম দেখো, আধুনিক সমাজে মানুষের এতো পরিচয়ের পরও জাতের মতো সংকীর্ণ কোনো পরিচয় থাকতে পারে বলে মনে করি না। তাই জাতের ব্যাপারে তুমি বা তোমার ফ্যামিলি রক্ষণশীল হলে আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। আর সনাতনী মানসিকতার কারো সঙ্গে সম্পর্ক করতে আগ্রহী নই।

আমার উত্তর শুনে বললো, সরি, তোমাকে প্রশ্নটা করার জন্য। আমিও তোমার মতো জাত-টাত তেমন বুঝি না এবং বদারও করি না।

বললাম, তারপরও তোমার ফ্যামিলির দৃষ্টিভঙ্গিটা ভালো করে বোঝো, প্রয়োজনে তাদের মতামত চাও। শেষ মুহূর্তে বিব্রত হতে চাই না।

জবাবে সে বললো, ফ্যামিলির মতামত জানা হয়ে গেছে। কোনো প্রবলেম হবে না। আমরা এগোতে পারি। সে ফোন নাম্বার দিল আর ফোন করতে বললো। আমার সার্বিক স্পষ্টবাদিতার জন্য কমপ্লিমেন্টস দিল।

মনে পড়ে হাইবেরিতে সেদিন আর্সেনালের পৃমিয়ার লীগের খেলা চলছিল। স্বভাবতই আমি চমৎকার মুডে ছিলাম। তাকে ফোন করলাম। সে ফোন ধরলো। ফোন পেয়ে সে খুব থৃলড হলো। খুশি যেন ধরে না তার। ঘণ্টা খানেকের ফোন আলাপ সৌজন্য দিয়ে শুরু করে পরিবারের সদস্যের ব্যক্তিত্ব এনাটমি করে শেষ করলাম।

ফোন রাখার কিছুক্ষণ পরই তার টেক্সট মেসেজ : I don't know what are you thinking, But, I'm Still thinking about you.

ঘণ্টাখানেক পর তার আরেকটা টেক্সট মেসেজ : What you've done? It feels like Jadu (জাদু), turning side to side.

পরদিন থেকে ফোন আর মেসেজের বন্যা শুরু হলো। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত যখনই সুযোগ পায় ফোন করে। ফোন আলাপের তৃতীয় দিনের মাথায় আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে বলে জানালো।

আমাকে ঘিরে তার চাঞ্চল্য, নির্ভরতা, অধিকার বোধ এবং চিন্তা, সর্বপরি তার মুহুর্মুহু ফোন আমাকেও তার প্রতি দুর্বল করে তুললো। আমিও বললাম *ভালোবাসি*। করতে চাইলাম বিয়ে, হলো প্রেম!

এরপরের কাহিনী শুধুই ভেসে বেড়ানোর, প্রেমের ভেলায়। ফোনেই আমরা সংসার গড়ি। সে হয় আমার *সোনাবৌ*। আমি তার *সোয়ামি*। রাতে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুমুতে যাই। আবার সকালে ঘুম ভাঙে তারই মেসেজে। এভাবে দুজনেই যখন প্রেমের *টেমসে* ভাসছি তখন ঠিক করলাম দেখা করবো।

আমাদের ডেটিংয়ের হাইলাইটসটাই তুলে ধরলাম।

গত বছর অক্টোবরে LIVERPOOL ST–এর MCDONALDS–এ আমরা প্রথম দেখা করলাম। তিন ঘণ্টার ডেটিংটা ছিল ডিসাস্টার। মাঝপথে তার বোনের আগমন, তার (রাজিয়ার) পুলিশ পুলিশ চাহনি আর শীতল আচরণ আমাকে আহত করলো। তাই দশ পাউন্ডে কেনা লাল গোলাপ দিয়ে তাকে গৃট করলেও এবং আসার সময় সে আই লাভ ইউ বললেও See you later বলে কৌশলে চলে আসি।

পরে আমরা ঠিক করলাম আবার দেখা করবো। জায়গা একই, শপ ভিন্ন। কাফে নিরো। কফি শপ। এবার তার আচরণ আর শীতল নয়, উষ্ণ। ফোনের সেই সহজ, প্রাণবন্ত *সোনাবৌ*। বড় বেশি আপন। আমাকেও নাকি তার খুব আপন, আন্তরিক, ভালোবাসার সোয়ামির মতো লাগে। ভালোবাসার মানুষরা যা করে আমরাও সেদিন ঠিক তাই করলাম। পাচ ঘণ্টার সেই ডেটিংটা ছিল স্বপ্নের মতো।

সেদিনের পর থেকে আমরা ঘন ঘন দেখা করতে থাকলাম। আমাদের ডেটিংয়ের গতি যেন VIRGIN ট্রেনের গতিকেও হার মানালো। তাকে ছাড়া একটা দিন যেন এক যুগ।

মাঝের একটা ডেটিংয়ে আমরা বেশ শরীরসর্বস্ব হয়ে উঠেছিলাম। মাসটা ছিল ডিসেম্বর। সেদিন আমরা কাফে নিরোর দোতলায় গিয়ে বসেছিলাম। জায়গাটা ছিল বেশ নিরিবিলি, সুন্দর সব সোফা পাতা। সে আমার কোলে শুয়ে ছিল। অন্যদিনের মতো খুনসুটি চলতে চলতে কখন যে একে অপরের ঠোঁট চুষতে শুরু করেছি টেরই পাইনি। আমি তার শরীরের অনাবৃত কোনো জায়গায়ই চুমু দিতে বাকি রাখিনি। সেও আমার সারা মুখ, নাক, কান, গলা চুমোয় চুমোয় ভিজিয়ে ফেলে। শেষে গলায় খুব জোরে একটা *লাভ বাইট* বসিয়ে দেয়।

একদিকে শারীরিক চাহিদা বাড়তে থাকা, অন্যদিকে তার নৈমিত্তিক Come and take me soon. Can't live with this feeling anylonger জাতীয় মেসেজে আমি রীতিমতো দিশাহারা। তাই তাড়াতাড়ি দুজনের অভিভাবকদের জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই বলে ফেলেছি। আমার গার্ডিয়ানদের সম্মতি আছে। সুতরাং তার গার্ডিয়ানদের মতামতটাই বাকি ছিল।

একদিন বিকেলে সে বললো, তার মা ও মামাকে আমাদের ব্যাপারটা বলেছে। তারা বলছেন, দেখছেন।

আমরা মিতচারের ভেতর দিয়েই অভিসার চালিয়ে যেতে থাকলাম। যতোবারই দেখা করি ততোবারই যেন সুখের নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করি।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে নেই বলেই হয়তো একদিন সন্ধ্যায় তার ফোন – হ্যালো, তোমার–আমার বিয়ে হচ্ছে না। আমার গার্ডিয়ানরা এ সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি নয়।

বললাম, কারণ?

তোমার–আমার জাত এক নয়!

মানে?

আমরা জাতে তালুকদার। তোমরা তালুকদার না। কম জাত! তাই এ বিয়ে হবে না। আমার মায়ের সাফ কথা, তিনি বেচে থাকতে এমন অসম বংশগত সম্পর্ক কখনো মেনে নেবেন না!

হিরোশিমার অ্যাটম বোমটা যেন আমার মাথায় ফাটলো। তাকে বলতে চাইলাম, জাতের সমস্যা থাকলে আগেই শেষ করতে পারতে। এখন কেন? কেন এতো ভালোবাসাবাসির পর? এগুলো কি তোমার জানা প্রেজুডিসের আওতায় পড়ে না?

বললাম না। কারণ সেও যে সুনীলের বরুনার মতো কেবলই নারী। তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ। শরীর উত্তীর্ণ কোনো মানবী নয়। রাগে, দুঃখে ফোনটা রেখে দিলাম।

বুঝতে পারলাম, তারা সেই দলেরই লোক যারা বিলেতের মতো মুক্ত সমাজে থেকে সভ্যতার সকল আশীর্বাদ নিয়েও মননে পশ্চাৎপদ। সভ্যতা এগোলেও তারা এগোয়নি।
ফোন রেখে কাদলাম প্রাণ ভরে, অঝোর ধারায়। এ কান্না অপমানের। মানুষ নামধারী অমানুষ কর্তৃক অপদস্থ হওয়া, এতোদিনের চেনা মেয়েটিকে চিনতে না পারার। জনবহুল এই নগরীতে আবার একা হলাম, বড় একা!

লন্ডন থেকে
lipu75@yahoo.co.uk

নীল চোখে

রাকিব

লেখাটি লিখছি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে। ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস–এ তখন প্রবল তুষারপাত। তুলার মতো তুষার পুরো ক্যাম্পাস ঢেকে ফেলেছে। ইংরেজরা তখন হোয়াইট কৃসমাসের আয়োজনে ব্যস্ত। আমার এক বন্ধুর বাসায় বসে U2-এর with or without you গানটি শুনছি আর ভালোবাসা সংখ্যায় কিছু লেখার চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করবো। তুষারের মতো অসংখ্য স্মৃতি মনের মধ্যে। সীমিত শব্দে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাহোক, এ সংখ্যায় আমার একটি অতীত তুলে ধরবো যেখানে আমি হারিয়েছি সবটুকু।
দিনটি ছিল ২০০৩ সালের। ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। কিছুটা ব্যস্ত পড়াশোনা নিয়ে। অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্রজেক্ট নিয়ে প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত লাইব্রেরিতে থাকতে হয়।
মেয়েদের ব্যাপারে কিছু উদাসীন, তখনই প্রথম পরিচয় তার সঙ্গে। নাম রুথ। খুব সুন্দর এক ইংরেজ মেয়ে। কমপিউটার গেমসের প্রজেক্ট করতে সে এসেছিল লিভারপুল ইউনিভার্সিটি থেকে।
সে ছিল আমার পরিচিত একমাত্র মেয়ে যার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলতে পারতাম না। কিছুটা ভয় পেতাম। কেননা তার চোখ দুটি এতোই সুন্দর যে, ভয় হতো তাকাতে, যদি হারিয়ে যাই! নীল রঙের সে চোখে সত্যিই হারিয়ে গিয়েছিলাম।
আমাদের ভালোবাসা হয়েছিল খুব অল্প সময়ে। আমাকে দারুণ পছন্দ করতো সে। কারণ অবশ্য আজ পর্যন্ত অজানা। রুথ থাকতো আমার হস্টেলের ঠিক পরেরটিতে। গভীর রাতে কখনো ফায়ার এলার্ম–এর শব্দে আমরা জড়ো হতাম খেলার মাঠে। অবাক হয়ে দেখতাম তাকে। মনে হতো একদৃষ্টিতে হাজার বছর ধরে তাকিয়ে থাকি, অবলোকন করি তার মোহিত সৌন্দর্য।
সে প্রায়ই আমাকে বলতো তার একটি স্বপ্নের কথা। যে স্বপ্নে সে এক ব্যস্ত কমপিউটার প্রফেশনাল। সারা দিন ব্যস্ততার পর যখন সে বাসার উদ্দেশে ট্যাকসিতে ওঠে তখনই প্রবল তুষার পড়া শুরু হলো চারদিকে। শুধু তুষার আর তুষার, মুহূর্তেই সব কিছু অচেনা মনে হয়। মনে হয় পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর নিজের ভালোবাসার মানুষটি। এ রকম আরো অনেক স্বপ্নের কথা সে বলতো আমাকে।
আমরা যখন এক সঙ্গে থাকতাম তখন প্রায়ই গভীর রাতে একে অপরকে গান শোনাতাম। সেগুলো যদিও অন্য কারো শোনার যোগ্য ছিল না। কিন্তু আমাদের কাছে তা ছিল এক সুরেলা সঙ্গীত। রুথের প্রিয় গান ছিল U2-এর with or without you. আমরা দুজনেই বেশ মজা করতাম, উইকএন্ডে আমরা বের হতাম লং ড্রাইভে। ড্রাইভ করতো রুথ। আমার কাজ ছিল গাড়িতে গান প্লে করা আর রুথকে ডাইরেকশন দেয়া যদিও আমাদের কোনো গন্তব্য ছিল না। গভীর রাতে ক্লান্ত হয়ে আমরা বাসায় ফিরতাম। ক্লা রুথের চোখে তখন ভর করতো এক উদ্ভট দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে ছিল এক প্রবল আকর্ষণ যা আমার সব ক্লান্তি দূর করে দিতো। তখন ভালোবাসার গভীর সান্নিধ্যে হারিয়ে যেতাম।

সে সময়গুলো ছিল সত্যিই মজাদার। মাঝে মধ্যে মনে হতো, জীবনে বুঝি আর কিছুই চাওয়ার নেই। কিন্তু মানুষের আত্মতৃপ্তি বড়ই বিচিত্র। সব কিছু পাওয়ার পরও এক মুহূর্তের বেদনা জীবনকে অর্থহীন করে দেয়। গ্রাস করে ফেলে সব প্রাপ্তিকে।

রুথের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এক কমপিউটার কম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে সে গিয়েছিল লিভারপুল। সেখানে তার মা থাকতেন। কথা ছিল, ইন্টারভিউ শেষে সে তার মাকে নিয়ে ম্যানচেস্টার আসবে আর আমরা সবাই উইকএন্ডে বেড়াতে যাবো লিভারপুল।

সেসব পরিকল্পনা আজো রয়ে গেছে। তবে স্মৃতি হিসেবে। ম্যানচেস্টার থেকে লিভারপুল যাওয়ার পথে মোটর ওয়ের কার অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় সে। তার ফোনের শেষ মেসেজটি ছিল আমার। সেখানে বলেছিলাম, Call me back, when u r free. সে কল ব্যাক আর কখনোই পাবো না আমি। দুঃখগুলো সুখের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়, নীরবে তা বিচরণ করে মানুষের মধ্যে। প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হয় এর অস্তিত্ব। U2-এর with or without you গানটি আজ আর শুনতে পাই না। এর without you অংশটি বড়ই কষ্ট দেয় আমাকে, নিয়ে যায় সে দিনগুলোতে যেখানে বিচরণ করতো কিছু স্বপ্ন। যা আজ এক পরাবাস্তব জগতের নীল ক্ষেত্রে আবদ্ধ।

ইংল্যান্ড থেকে

bluezone3@hotmail.com.uk

প্রেমের যোগিনী

রুমি

ছোট উপজেলা শহরে আমার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই খুব চঞ্চল প্রকৃতির ছিলাম। সারাক্ষণ আনন্দে মেতে থাকতাম। হলফ করে বলতে পারি, একের অধিক দিন মন খারাপ করে থাকতে হয়নি কোনো কারণে। সুন্দরী আর সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় ক্লাস এইট অথবা নাইনে পড়ার সময় থেকেই রোমিওদের উপস্থিতি বেশ টের পেতাম। কিন্তু তারা পাত্তা পাওয়ার সুযোগ পায়নি কারণ ছেলেদের কিছু ন্যাকামো আমার একদম অপছন্দের।

ক্লাস টেনে পড়ার সময় নিজের মাঝে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। প্রায়ই বিষণ্ণতায় ভুগি, কথা গুছিয়ে বলতে পারি না, অকারণে হেসে উঠি! গাম্ভীর্য ভাব আমার মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এর কোনো কারণ খুজে পাই না। কিসের যেন একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। মনটা বেশ বেয়াড়া হয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে তার অন্য রকম শ্রান্তিবোধ আমাকে বিচলিত করে তোলে। মনটা ততোদিনে এতো আগ্রাসী হয়েছে যে, মাঝে মধ্যে মনে হতো কারো মিষ্ট কথা বা চিঠিতে আমার কিছু হবে না, আমার আরো কিছু চাই! কি আশ্চর্য!

এরই মধ্যে আমার প্রিটেস্ট পরীক্ষা চলে আসে। কোনো একদিন পরীক্ষা শেষে স্কুলের পোশাক না পাল্টে দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসি – ইচ্ছা একটু সজীব বায়ু সেবন। হঠাৎ চোখ পড়ল পশ্চিমের নীলু ভাবীদের ছাদে। দেখলাম একটি ছেলে যেখানে পেয়ারা গাছটার ডালপালার ছায়া পড়েছে সেখানে একটা বই হাতে নিয়ে পড়ছে। একবার তাকানোর মতো করে চোখ ফিরিয়ে আবার বইতে মনোযোগ দিল। আমি আধা ঘণ্টার মতো ছিলাম কিন্তু সে আর একবারও তাকায়নি। নীলুভাবীদের বাড়ি আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে। ভাবীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব। প্রায় প্রতিদিনই ওই বাড়িতে যাই। ভাবীর সঙ্গে গল্পগুজব করি, ভাবী আমার সব কথা মন দিয়ে শোনে। এ জন্য ভাবীকে আমার খুব পছন্দ। ভাবীর স্বামী টুটুলভাই ব্যাংকের ম্যানেজার। ভাবীদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটাকে তেমন দেখতে পাই না। তবে তার উপস্থিতি বেশ টের পাই। মুখ ফুটে ভাবীকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। এদিকে প্রায় প্রতিদিনই ছেলেটা একবার ছাদে ওঠে বই হাতে নিয়ে। আমিও বারান্দায় বসি। একদিন ভাবীর মুখেই তার পরিচয় পাওয়া গেল –

ভাবীর বড় আপার ছেলে, নাম রাতুল। সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র – যাকে মাস খানেক ধরে দেখে আসছি। প্রায় প্রতিদিনই দেখি, কিন্তু কথা হয়নি একবারও। ছেলেটাকে আমার মোটেও পছন্দ হয়নি – দেখতে রোগা, তার উপর মাথার চুলগুলো সর্বদা এলোমেলো থাকে। সব সময় যেন ভাবুকচিত্ত, কথা বলে কম, চোখে চোখ পড়লেই চোখ নামিয়ে নিতো। এটাকে আমার অতিরিক্ত অহঙ্কারপূর্ণ আচরণ বলে মনে হতো। মাঝে মধ্যে রাগ হতো, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতাম – কার ওপর রাগ হচ্ছে, তার ওপর? কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয়নি! সে এমন কোনো গুরুতর আচরণ আমার সঙ্গে করেনি বা করলেও সভ্যতার বিচারে তা ধরা যায় না। তবে কেন আমি রাগ করছি? একথা ভেবে লজ্জা পেতাম, তবুও মাঝে মধ্যে অমন হতো। অবস্থা এমন হলো তাকে দেখলে বা চোখে চোখ পড়লে ভীষণ লজ্জা লাগতো আর অস্বস্তি বেড়ে যেতো। অবশ্য এটা অন্য কারো নজর কাড়েনি।

মনে মনে ঠিক করলাম ওই বাড়িতে বিনা প্রয়োজনে আর যাবো না। কিন্তু আশ্চর্য! ওই সিদ্ধান্তের পর পরই আমার মন যেন আরো বেশি করে তাড়া দিতে লাগলো সেখানে যাওয়ার। কি এক অজানা আকর্ষণে বার বার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে সেখানে। বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। একটা কিছু করতে হবে। অন্তত সংকোচ কাটিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সুযোগও এসে গেল। একদিন বিকেলে ভাবী এক গ্লাস গরম দুধ দিয়ে বললো তার ঘরে দিয়ে আসার জন্য। আর অমনি আমার হার্ট বিট বেড়ে গেল! তারপরও ওড়নাটা মাথায় দিয়ে তার ঘরে গেলাম। ঘরটা তেমন গোছালো নয়, পড়ার টেবিলের দুই পাশে এখানে সেখানে টবের গাছপালা দেখে অবাক হলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিল তাই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। সে হাতের দুই তালুতে মাথা রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল। কেমন করে আমার আগমন টের পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। আমি মৃদু হেসে বললাম, কেমন করে টের পেলেন যে কেউ ঘরে ঢুকেছে?

তোমার নূপুরের শব্দে। কথাটি বলে আমার পায়ের দিকে ইশারা করল। এতে আমার লজ্জা আরো বেড়ে গেল। প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললাম, আমার নাম রুমি।

কথাটি শুনে সে ঠোঁট দুটো প্রসারিত করে মৃদু হাসির ভঙ্গিমা করলো যা আমার খুব ভালো লাগলো। বললো, আমি রাতুল।

তারপর কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার পর বাড়ি ফিরে এলাম। বেশ ভালো লাগছিল। ওড়নাটা দিয়ে ঘোমটা টেনে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে সব কিছু সহজ হয়ে এলো। রাতুলের কাছে প্রায়ই যেতাম। এর অবশ্য দুটি কারণ ছিল। এক. তার সান্নিধ্য আমার ভালো লাগতো। তার মনটা ছিল অনেক বড় যা আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম। সেখানে না ছিল কোনো সংকীর্ণতা, না ছিল কোনো জড়তা আর সব কিছুতেই ছিল চমৎকার ছন্দ। তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করতো। দুই. তার কাছে পড়া দেখিয়ে নেয়া যেতো।

প্রতিদিন বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছে যাওয়া আমার অভ্যাসে পরিণত হলো। একটা বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুললো। আমি কি ধীরে ধীরে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছি? আসলে তখনো রাতুলকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। তার প্রতি ততোদিনে আমার সব সংকোচ জড়তা কেটে গেছে ঠিকই কিন্তু আমার ভেতরের অস্বস্তি যেন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সারাক্ষণ তার কথা মন জুড়ে থাকতো। বিশেষ করে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে। যতোক্ষণ তার কাছে থাকতাম মনে হতো যেন স্বপ্নের জগতে আছি! সে খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারতো আর হাসি ছিল ভুবন ভোলানো। তার মায়াময় মুখখানি আমাকে সর্বদা আকর্ষণ করতো। তার এমন কোনো দিক ছিল না যা আমার অপছন্দের, যেটা তার সঙ্গে মেশার পর অনুভব করতে পেরেছিলাম।

এভাবে দিনে দিনে একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পারলাম তা হলো, তাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না! আমার বেশ মনে আছে একদিন তার জ্বর হয়েছিল, আমি তার কপালে জলপট্টি দিয়েছিলাম। প্রচণ্ড

জ্বরে সে মাঝে মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ছিল। আমি তার পাশে অনেকক্ষণ ছিলাম। প্রায়ই টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটো তার কেপে উঠছিল।

ওই সময় আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যা উপলব্ধির ব্যাপার। তবে একটা কাজ করেছিলাম তা হলো, গভীর আবেগে তার ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিলাম আলতো করে। তার বুকে মাথা রেখেছিলাম আর সে সময় আমার চোখের জলে তার বুকের কিছু অংশ ভিজে গিয়েছিল। সেদিন সে কিছু বুঝতে পেরেছিল কি না তা এখনো অজানা। কিন্তু সে দিনের পর থেকে তার প্রতি এতো দুর্বল হয়ে পড়লাম যে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পর্যন্ত পারতাম না।

এভাবে তাকে পাওয়ার বাসনা অন্তরে অনুভব করলাম এবং নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। কারণ আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। অকারণে চোখ ভিজে যেতো। আমি যে খুব আবেগপ্রবণ হয়তো তা প্রমাণ করার জন্য। পাচ দিন তার জ্বর ছিল। সে পাচ দিন এক প্রকার না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। জ্বরে তার চেহারা যতোটা না খারাপ হয়েছিল তার চেয়ে বেশি খারাপ হয়েছিল আমার চেহারা।

বাড়ির লোকেরা আমার বিষয়টি লক্ষ্য করে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না আমার কি ঘটছে। দিনের পর দিন যায় কিন্তু সংকোচে তাকে কিছু বলতে পারিনি। বুঝতে পারছিলাম না সে বিষয়টি কিভাবে নেবে। সে আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করে একদিন জানতে চাইলো আমার কি হয়েছে। সেদিন উত্তরে কোনো কিছু বলার আগে চোখের পানি সামলাতে পারলাম না। সে বসা থেকে উঠে দাড়ালো। ধীরে ধীরে কাছে এসে বললো, কি হয়েছে সত্যি করে বলো। আমি কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কথা বের হচ্ছে না। সে কোনো কথা না বলে দুই হাতে আমার মুখখানি তুলে ধরে অপলক দেখতে লাগলো। আমার মধ্যে ততোক্ষণে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। পা দুটো কাপছে, পুরো শরীর শিউরে উঠছে। আর পারলাম না – শরীরের ভর তার ওপর ছেড়ে দিলাম। জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে তার বুকে লেপটে থাকলাম কিছুক্ষণ। সে বললো, পাগল মেয়ে! একেবারে প্রেমের যোগিনী সেজে ছিলে। গভীর আবেগে তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, হু।

সেই থেকে শুরু। তার স্পর্শে আমি আবার যেন সজীবতা ফিরে পেলাম। আমি খুবই আক্রমণাত্মক ছিলাম এবং সে আমার সবকিছুকেই স্বাচ্ছন্দে প্রশ্রয় দিতো। সে নিজ থেকে কিছু করতো না। আমার আবেগের সব তেজ গিয়ে পড়তো তার ওপর। কতোদিন দুজনে হারিয়ে গেছি একান্তে। সেখানে সে ছিল সংকোচপ্রবণ আর আমি ছিলাম উদ্ধত। এখন এতোদিন পর মনে হয়, আসলে সে সময় আমি ছিলাম বিকৃতমনা।

এভাবে সময় গড়াতে থাকে। প্রায়ই সে আমাকে প্রেমের যোগিনী বলে ক্ষেপাতো। নীলুভাবী আমাদের সম্পর্কটা কিছু আচ করেছিল কিন্তু কিছুই বলেনি। দেখতে দেখতে আমার ফাইনাল পরীক্ষা চলে এলো। তাকে পেয়ে আমি সবদিক দিয়ে সুখী ছিলাম। এক সময় পরীক্ষা শেষও হয়ে গেল। সে সময় ছোট মামার বিয়ে উপলক্ষে মামার বাড়ি যাওয়ার দুর্ভাগ্য হলো। তাকে ছেড়ে মোটামুটি এক সপ্তাহ কিভাবে থাকবো সেই চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরলো। যাওয়ার সময় যে কতোবার চুমু খেয়েছি, তবুও যেন আশা মেটে না, শান্তি আসে না।

মামার বাড়িতে বাধ্য হয়ে দশটা দিন থাকতে হয়েছিল। ওই দশটা দিন যে কিভাবে কেটেছিল তা মনে করে এখন আর আবেগমথিত হতে চাই না। তবে প্রতিক্ষণেই তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে তার স্পর্শ, অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করতাম।

এভাবে দশ বছর তুল্য দশটা দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তার সঙ্গে এতোদিন পর দেখা হবে। ভালো করে সাজলাম। সচরাচর যে পোশাক পরি তা বাদ দিয়ে শাড়ি পরলাম। মাথায় ঘোমটাও দিলাম তার ঘরে ঢোকার আগে। কিন্তু ঘরে ঢুকে অবাক হলাম যখন দেখলাম ঘর ফাকা। মানে সে নেই। ভাবী একটা ছোট চিরকুট দিয়ে নীরব রইলো। চিরকুটে লেখা আছে –

আমি পারলাম না রুমি, আমায় ক্ষমা করো।

সেখানেই ধপ করে বসে পড়লাম। তারপর কি হয়েছিল কিছুই বলতে পারবো না। রাতে নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমার খাটে। শিয়রে মা, আব্বা আর সবার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে বুঝতে পারলাম কি হয়েছিল আমার।

এভাবে স্বল্পভাষী মানুষটা স্বল্প কথায় আমাকে সত্যিকারের প্রেমের যোগিনী করে রেখে গেল!

মেহেরপুর থেকে

ভাইয়া

আমি একজনকে ভালোবাসি। ভয়াবহ রকম ভালোবাসি। আমার সব অনুভূতি তাকে ঘিরে। সম্পর্কে তিনি আমার কাজিন। ধারা যাক, তার নাম *সমুদ্র*। আমার কাছে তিনি সমুদ্রই। এ রকম বিশাল মনের মানুষ আর হয় না। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি। একটা মানুষকে যে কি পরিমাণ ভালোবাসা যায় হয়তো তার সঙ্গে না মিশলে বুঝতাম না। প্রতিটা মুহূর্ত তাকে ভেবে আমার কাটে, তিনি তা বুঝতে পারেন না। কেন যে এতো ভালোবাসলাম জানি না। তার ব্যক্তিত্ব, রুচি, কথা, মোটামুটি সবকিছুই আমার ভালো লাগে। আমার অনুভূতি তাকে বোঝাতে পারলে জীবনটা অন্য রকম হতো।

প্রথম থেকেই তাকে ভাইয়া ডাকি। আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমার প্রতি জন্মদিনে মাথায় হাত দিয়ে Wish করেন। ঠিক সে মুহূর্তে মনে হয় এ জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই। সবই পেয়েছি। মনে হয় তার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়। ভাইয়ার প্রতি আমার ভালোবাসার গভীরতা লিখে প্রকাশ করতে পারবো না। ভাইয়ার সঙ্গে সম্পর্কের শুরুটা ছিল এ রকম–

দিনটা ছিল ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন খুলনার স্থানীয় একটা সরকারি কলেজে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেদিন কলেজ থেকে বাসায় ফেরার পথে ভাইয়ার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, কেমন আছো তুমি? তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। এক সময় দেখা করো। আমি বললাম, ঠিক আছে ভাইয়া। তখন থেকেই আমার মধ্যে একটা অন্য রকম ভালো লাগার অনুভূতি বিরাজ করতে লাগলো। এর আগেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। কিন্তু কখনো এমন অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি।

ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিলেন। তার ধারণা আমি খুব ভালো বন্ধু হতে পারবো। তার প্রতিটা কথা আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। সবশেষে যেটা বললেন তা হলো বন্ধুত্বের বাইরে একটা সম্পর্ক তিনি করতে চান। নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ভিত্তিক সম্পর্ক। আমারও কৌতূহল হলো। অবশ্য আমার মধ্যে কৌতূহলের চেয়ে ভালো লাগাটাই বেশি কাজ করছিল। চুক্তির শর্ত ছিল, বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সারা জীবন থাকবে আর বন্ধুত্বের বাইরে যেটা তার মেয়াদ তিন মাস। প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখতে হবে।

২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু। সেদিন তাকে আমি চারটা লাল গোলাপ গিফট করি। গোলাপগুলো নিয়ে বললেন, লাল গোলাপ দেয়ার অর্থ জানো? তাও আবার ভ্যালেনটাইনস ডে–তে! আমি বললাম, জানি না। তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তখন মনে মনে বললাম, আপনাকে লাল গোলাপ দেয়া আমার ভুল হয়নি। কারণ আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী লাল গোলাপ তাকেই দেয়া যায় যার প্রতি ভালোবাসা খুব গভীর।

দুইজন দুইজনকে প্রতিদিন চিঠি লিখি। আমার চিঠি পড়ে কোনোদিনও তার মন ভরতো না। তার অভিযোগ, আমি তাকে খুব ছোট চিঠি লিখি। তার কাছে লেখার ব্যাপারে আমি খুবই কৃপণ। প্রতিদিনই দেখা করি। কতো সময় যে তার সঙ্গে কাটিয়েছি কোনো হিসাব নেই।

সে আমার মনের সবটুকু স্থান দখল করে নিয়েছে। আমাদের বাসায় সব সময় আসতেন। তার ভালোবাসা, আদর, স্নেহ অনেক পেয়েছি। কিন্তু তার পরও আমার তৃষ্ণা মেটে না। আমরা দুইজন কেউই চুক্তির শর্ত মানতে পারিনি।

আমাদের সম্পর্কের মেয়াদ ছিল তিন মাস। কিন্তু ভালোবাসা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে আবদ্ধ থাকে না। কখন যে তার প্রতি আমার ভালোবাসা *তিন মাসকে* ছাড়িয়ে তিন বছর অতিক্রম করেছে বুঝতে পারিনি। ভাইয়ার প্রতি আমার যে ভালোবাসা তা অনন্তকালের। এর কোনো শেষ নেই।

অনেক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। দেখা না হলেও আমার মন থেকে তাকে একটুও আড়াল করিনি। তার দেখা পাওয়ার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করি। জানি না আসছে ভ্যালেনটাইনস ডে-তে তাকে কাছে পাবো কি না।

তাই প্রিয় ভাইয়াকে বলছি, ভাইয়া, আমি জানি *যায়যায়দিন* আপনার খুব প্রিয়। আপনিও এক সময় লিখতেন এই পত্রিকায়। অতএব, সম্পাদক ভাইয়া যদি আমার এ লেখার প্রতি সুদৃষ্টি দেন তাহলে এ লেখা আপনার কাছে পৌঁছাবেই। আমার বিশ্বাস, এই অনুভূতি আপনার কাছে, পাঠকদের কাছে প্রকাশ করার সুযোগ তিনি অবশ্যই করে দেবেন।

ভাইয়া, যেখানে যে অবস্থায় থাকি আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা কখনোই বিকৃত হবে না। ভালো থাকবেন। আসছে ভ্যালেনটাইনস ডে-তে আপনাকে অনেক লাল গোলাপের শুভেচ্ছা আর আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা জানাচ্ছি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রথম প্রেমের ছোঁয়া

সে আমার চাচাতো ভাই অথচ জন্মের পর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। মায়ের মুখে চাচাদের কথা শুনেছি। একদিন টিভিতে লাভ স্টোরি সিনেমাটি দেখলাম। দেখার পর থেকে কেন জানি না চাচাতো ভাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

১৯৯৭ সালে হঠাৎ করে চাচা আমাদের বাড়িতে এলেন এবং তাদের বাসার ঠিকানা দিলেন। এরপর আমার ভাই মাঝে মধ্যে তাদের বাসায় যেতো। আরেক দিন চাচা আমাদের বাড়িতে এলেন, সঙ্গে অন্য এক চাচার ছেলে। তখন আমি ছাত্রী। সামনে টেস্ট পরীক্ষা। তাই প্রাইভেট পড়তে না গেলে স্যার বকাঝকা করতেন। পড়তে গেলাম কিন্তু মন পড়ে রইলো তার কাছে। পড়া শেষে বাড়িতে এসে সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটির দেখা পেলাম। ভাইবোন সবাই এক সঙ্গে বসে গল্প করতাম। গল্পের মাঝে একদিন প্রসঙ্গ উঠলো কে কাকে ভালোবাসে।

সে বললো, একজনকে ভালোবাসে, তার নাম মণি। তার বিয়ে হয়ে গেছে তবুও তাকে ভুলতে পারে না। কথাটা শোনামাত্র মনের ভেতর একটা হোচট খেলাম।

একদিন প্রাইভেট পড়ে বাড়িতে এলাম। সে বললো, তুমি আমাকে ফাকি দিয়েছো। সে আমার খাতায় একটা গান লিখে দিয়েছিল, যেওনা তুমি বলো না বিদায় যেন আলো নিভে যায় তুমি চলে গেলে। সে গানটি সংরক্ষণ করতে বলেছিল।

আমি তাকে একটি রুমাল দিয়ে বলেছিলাম, রুমাল দিলে ঝগড়া হয়।

সে বলেছিল, না। রুমাল দিলে বন্ধু হয়।

সে এখানে এসে মাত্র দুই তিন দিন থাকলো। এর মধ্যে তার কথা বলার ধরন, ঠাট্টা ও দুষ্টুমি আমার মনকে পাগল করলো। ভালো লাগা কাকে বলে বুঝলাম, তাকে দেখার পর। তার সান্নিধ্যে কেটে গেল কয়েকটি দিন, কতোগুলো মুহূর্ত।

সে একদিন বললো, কাল আমরা চলে যাচ্ছি। কথাটা শোনামাত্র আমার মুখে জমে উঠল আষাঢ়ের মেঘ, ঝরলো বারিধারা। রাতে ঘুমাতে পারলাম না। তার সান্নিধ্যে ভুলেই গিয়েছিলাম, তাকে একদিন চলে যেতে হবে। সে চলে গেল, অনুভব করলাম নিঃসঙ্গতা। ছটফট করেছি অব্যক্ত বেদনায়। সে চলে যাওয়ায় সেদিন আমার জীবনের আলো যেন নিভে গিয়েছিল। তার লেখা গানটি সংরক্ষণ করার জন্য গানের

ক্যাসেটটি অনেক খুজেছিলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। তবে সে যে কাগজে গানটি লিখেছিল সেটি আজো সংরক্ষিত আছে।

তার বিদায়ে একাকী মুহূর্তে মনে হলো, ভালোভাবে পড়ালেখা করে তার যোগ্য হবো, তারপর ভালোবাসার কথা জানাবো। কারণ সে অত্যন্ত মেধাবী। বাংলাদেশের নামি ইউনিভার্সিটির ছাত্র। যাবার সময় বলেছিল, সে আবার আসবে, আমাদের কাছে চিঠি পাঠাবে। আমরা সব ভাইবোন তার কাছে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু তার কোনো উত্তর পেলাম না।

২০০০ সালে আমি এসএসসি পাস করলাম। ইন্টারমিডিয়েটে পড়াকালীন অনেক ছেলে আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল, অনেকে চিঠিও লিখেছিল। কিন্তু তাদের কারো ডাকেই সাড়া দিতে পারিনি। একটি ছেলে চার বছর আমার পেছনে আঠার মতো লেগেছিল। পাত্তা দিইনি। সে বলেছিল, দেখবে কোন নায়ককে আমি বিয়ে করি।

আমি এইচএসসিতে পড়াকালীন আমার এক বন্ধুর ঠিকানা তাকে দিয়েছিলাম। ওই ঠিকানায় চিঠি লেখার জন্য। তবুও সে কোনো চিঠি দিল না। খুব কষ্ট পেলাম। তারপরও আমি তাকে চিঠি লিখতাম। এক সময় তার ওপর ভীষণ রাগ হলো। চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলাম। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসার কথাটা তাকে কখনো জানাতে পারিনি। এর কারণ কিছুটা ভয় ও সংকোচ। তার মোবাইল নাম্বার বই-খাতায় লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু কখনো ফোন করিনি।

২০০৪ সালে বিশেষ প্রয়োজনে তাকে ফোন করেছিলাম। সে বললো, তুমি কেমন আছো? তোমার ভাইয়া তো তোমাদের বাড়িতে আসবে, তুমি আর চিঠি লেখ না কেন? উত্তরে শুধু একটি কথাই বললাম, ভালো আছি। সে বললো, না, তুমি ভালো নেই। আমি আর কিছুই বললাম না। প্রয়োজনীয় কথা বলে রেখে দিলাম। দীর্ঘদিন তাকে না দেখে তার সঙ্গে কথা না বলেও ক্ষণিকের জন্য ভুলে থাকতে পারতাম না।

২০০৫ সালের মাঝামাঝি তার কাছে একদিন ফোন করেছিলাম। সে বললো, হ্যালো।

বললাম, কেমন আছেন?

বললো, ভালো। আপনি কে?

আমার নাম শুনেই বললো, তুমি, এতো বছর পরে কি ব্যাপার!

সে বললো, তোমার বন্ধুর ঠিকানায় তোমাকে দুটি চিঠি লিখেছিলাম।

সেদিন সে বললো, আমি তোমাদের বাড়িতে আসবো যদি তুমি আসতে বলো।

বললাম, ঠিক আছে আসুন।

সে বললো, তোমার পরীক্ষা শেষ হোক, তারপর আসবো।

তার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আমার সব রাগ যেন পানি হয়ে গেল। আমার অনার্স প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শেষ হলো। তাকে প্রায়ই একটি নাম্বার থেকে মিসকল দিতাম। সে সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম্বারে কল করতো। এভাবে তার সঙ্গে কথা হতো। সে আমাকে চিঠি লিখতে ও ছবি পাঠাতে বললো।

বললাম, আপনার সঙ্গে দেখা হবেই, চিঠি দিয়ে কি হবে।

সে বললো, যদি তুমি চিঠি আর ছবি না পাঠাও তাহলে তোমাদের বাড়িতে যাবো না।

এই প্রথম তাকে আমার ভালো লাগার, ভালোবাসার কথা জানালাম চিঠির মাধ্যমে। তার কাছে ফোন করলাম। বললাম, চিঠি পেয়েছেন।

বললো, পেয়েছি। কি লিখেছো ওসব?

বললাম, যা সত্যি তাই।

সে বললো, আমি এলে আমাকে আদর করতে হবে।

আমি রোজা ছিলাম, এ কথাটা শুনে আমার সারা শরীর কাপছিল। বাড়িতে এসে সারাক্ষণ তার সেই কথাটা ভাবছিলাম।

ঈদের পর তার কাছে ফোন করলাম। সে বললো, আমি কাল আসছি। পরের দিন আবার ফোন করলাম।

সে বললো, আমি তোমাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছি। আমার পাওনা আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তার আসার কথা শুনে কি যে আনন্দ লাগছিল তা লেখার ভাষা আমার জানা নেই। তাকে দেখে মনে হলো, যেন আকাশের চাদ হাতে পেলাম। তাকে এতো কাছে পেয়েও একটু কথা বলার সুযোগ হলো না। তার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব লজ্জা লাগছিল। একদিন সকাল বেলা সে পাশের ঘরে বসে আমাকে ডাকলো। আর বললো, যার জন্য এলাম সেই আমার সঙ্গে কথা বলে না। এভাবে কি একা একা থাকা যায়! আমি ঘরে গেলাম। আমাকে কাছে ডাকলো। গেলাম না। সে পেছন থেকে এসে আমার গালে একটা চুমু দিল। সেই মুহূর্তে আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। এখনো ওই কথাটা মনে পড়লে নড়াচড়া করতে পারি না। সম্ভবত সে আমাকে দুই তিন বার চুমু দিল। আমি বাধা দিতে পারলাম না। মনে হলো যেন আমার কোনো হিতাহিত জ্ঞান নেই। আমার জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। সেদিন তার কাছ থেকে সরতে ইচ্ছা করছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন পৃথিবীর সব শান্তি, সব সুখ এখানেই। কেউ যদি দেখে ফেলে সেই ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দুপুরে ঘরে বসে খাচ্ছিলাম, সে আমার গালে চুমু দিল। আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পরের দিন তার যাবার পালা। সে চুমু দিতে চাইল। কিন্তু আমি বাধা দিলাম। আমাকে কাছে ডাকলো, গেলাম না। কারণ তার চলে যাওয়াটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না।

শুরু হলো আবার কাদার পালা। সে যাবার সময় আমাকে একটা ছোট চিঠি লিখেছিল। তাতে লেখা ছিল –

জান, বিশ্বাস করো, আমি তোমার জন্য এখানে এসেছিলাম। তোমাকে অনেক পছন্দ করি বলেই এখানে আসা। আমার খুব জরুরি একটা কাজ আছে। তাই চলে যেতে হলো। তুমি সুযোগ পেলে আমাদের বাসায় যাবে, কথা হবে। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

সে চলে গেল। মাত্র দুই দিন থাকলো। প্রথম প্রেমের প্রথম ছোয়া দিয়ে দূরে চলে গেল। মনে হলো, আমার ভালোবাসা মাখানো হৃদয়টা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে সে চলে গেল।

তার জন্য রাতে আমার ঘুম আসে না। তার কথা ভাবলেই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে। মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে ফোনে কথা বলি। যেদিন তার সঙ্গে কথা বলি সেদিন একটু ভালো লাগে। তারপর আবারো আগের অবস্থায় ফিরে যাই। মনে হয়, এতো কষ্ট পাওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। যার জন্য এতো কষ্ট তাকে কেন ভুলতে পারি না। প্রায় দুই মাস আগে সে এসেছিল। সে চলে যাওয়ায় মনে হয়েছিল আমার জীবনের সব আনন্দ-হাসি যেন শেষ হয়ে গেছে। আমি তার ছবিটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। তার বাবা-মা, ভাইবোন সবার এতো বেশি প্রশংসা শুনেছি যে, খুব ইচ্ছা হয় তাদের পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার। কিন্তু সে কি আমাকে বানাবে তাদের পরিবারের সদস্য! আমি তার অযোগ্য। তাকে ছাড়া আমি কিভাবে বাচবো। তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেও পারি না। এতো বছর ধরে যাকে ভালোবাসি, তাকে চাওয়াটা কি অন্যায়?

বিধাতাকে বলি, মিলন যদি নাইবা হবে কেন তাকে পাঠালে দৃষ্টির সীমানায়। জানি না, বিধাতা তাকে আমার ভাগ্যে রেখেছেন কি না। তবুও তাকে নিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখি, যেখানে থাকি আমি আর সে।

আমার স্বপ্নে তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা থাকে না। স্বপ্নে তাকে কাছে পাই। যদি সত্যিই কোনো দিন তাকে আমার নিজের করে পাই সেদিন তাকে এক লাখ চুমু দেবো। তাকে এতো ভালোবাসা দেবো, সে কোনো মেয়ের দিকে ভুল করেও তাকাতে পারবে না। আমার জীবনে কি আসবে সেই দিনটি?

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

তানিয়াআপু

শরীফ হোসেন সাঈদ

তানিয়াআপুকে আমার খুব ভালো লাগত। যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন আমাদের পরিবার সিদ্ধিরগঞ্জে চলে আসে। আমরা যে বাসায় থাকতাম তার পাশের বাসাটি ছিল তানিয়াআপুদের। আপুর ছোটভাই তানভীর–এর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো যেহেতু আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন তানিয়া আপু ক্লাস টেনে পড়তো। আপু ছিলেন খুব সুইট চেহারার মেয়ে। সে যখন শাদা স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যেতো কিংবা স্কুল থেকে ফিরে আসতো তখন কি যে ভালো লাগতো! আমি শুধু আড়ালে আপুর দিকে চেয়ে থাকতাম। আপুর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তার দুটো চোখ এবং কথা বলার ভঙ্গি। যখন আমাকে ডেকে বলতো– শরীফ এটা এনে দাও তো, ওটা করো তো তখন আমার কি যে ভালো লাগত সে কথা বলার নয়। বছর শেষে যখন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতো তখন সবাই মিলে পিকনিক–পিকনিক খেলতাম। পিকনিক–পিকনিক খেলায় নানান কিছু আয়োজন করা হতো। আমরা বিভিন্ন খেলার আয়োজন করতাম আর সেসব খেলায় নূপুরআপুদের সব বোনেরা মিলে তানিয়াআপুকে হারিয়ে দিতো। তানিয়াআপু হেরে গিয়ে সরে পড়তো কিন্তু নূপুরআপুরা সব বোনেরা মিলেই খেলার পুরস্কার ভাগাভাগি করে নিয়ে যেতো।

একদিন পিকনিকের সময় আম্মুর কাছে টাকা ছিল না বলে আমাকে পিকনিক খেলতে দিতে রাজি হলেন না। এ কথা তানিয়াআপু শুনে আম্মুকে পটিয়ে–পাটিয়ে রাজি করিয়ে ফেললেন। বললেন, টাকা দিতে হবে না ও তো ছোট মানুষ অবশ্য পরে আম্মু সে টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। আপু যখন পিকনিকের সময় ব্যস্ত হয়ে পেয়াজের ছোলকা ছিলা, আলু কাটাকাটি কিংবা চাল বাছতেন তখন তাকে খুব ভালো লাগতো। রান্নাবান্নার পর আমরা যখন খেতে বসতাম প্রায়ই তানিয়াআপু শাড়ি পরত তখন তাকে যে কি ভালো লাগতো বলে বোঝানো যাবে না।

একদিন আপুর হাতের আঙুল ব্লেড দিয়ে কেটে গেল। তখন আমি আর হিমেল আমার কাকার ফার্মেসির দোকানে ছুটে গেলাম। এসে দেখলাম আঙুল থেকে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। কাকা আমাকে বললেন তানিয়াআপুর হাতটা ধরতে। তখন হাতটা ধরে রাখলাম আর কাকা আঙুলটা ব্যান্ডেজ করে দিলেন। আপুর হাতটা ধরতে পেরেছিলাম বলে সেদিন আমার কি যে ভালো লেগেছিল, বলার নয়। আপুকে আমার এতো ভালো লাগতো যে আমি কখন কি করবো ঠিক বুঝতে পারতাম না। এক রাতে সিরিঞ্জে পানি ভরে জানালার ফাক গলিয়ে তার গায়ে পুশ করে দিলাম। আপু ভয় পেয়ে চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দিলো। তা দেখে সেদিন সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হিমেল যখন আপুর নামে খারাপ কথা বলতো তখন আমার খারাপ লাগতো। ইচ্ছা করতো তার গায়ে ধড়াম করে ঘুষি বসিয়ে দিই এবং তাই করতাম যদি তার নাদুস–নুদুস শক্তিশালী দেহটা না থাকতো। সেই খারাপ কথাগুলো জমা করে তানিয়াআপুর পিছু ঘুরতাম আর সে যখন কিছু বলার জন্য আমার দিকে তাকাতো তখন মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যেতো।

একদিন আপু তার স্কুল জীবনের বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ছবির একটা অ্যালবাম নিয়ে এলেন। প্রায়ই তাদের বাসায় গিয়ে ছবিগুলো ঘেটেঘুটে দেখে আসতাম এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতাম ছবিগুলো চুরি করবো ভেবে। আপু যখন এসএসসিতে একটা ফাটাফাটি রেজাল্ট করে কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন তখন সাদা স্কুল ড্রেসের পরিবর্তে বোরখা পরা শুরু করলেন। আপুকে শাদা ড্রেসে দেখতে না পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। আপু বোধ হয় জানতেন না শাদা ড্রেসে তাকে কতো সুন্দর দেখাতো। আপুকে আমি কতো ভালোবাসতাম সেটা প্রথম বুঝতে পারি যখন ক্লাস টেনে পড়ি। সেদিন ছিল শবেবরাত–এর রাত। সে রাতে তার এক ছেলে বন্ধু তাদের বাসায় বেড়াতে এলো। আপুকে তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে দেখেই আমার পিত্তি জ্বলে উঠলো। বুকটা ধুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগলো। অন্যদিনের মতো সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে আপুকে নিয়ে

সুন্দর কিছু ভাবতে পারলাম না। খুব কষ্ট পেলাম। যখনই এ ব্যাপারে কষ্ট পেতাম তখন নিজেকে বোঝাতাম শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছি কেন? একদিন আপুর বিয়ে হয়ে যাবে তখন তো আর কষ্ট পাওয়া চলবে না। একদিন আপুদের বাসায় কেউ ছিল না। আমি চুপি চুপি বাসায় ঢুকে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য আপুর ছবির অ্যালবামটা বের করে সুন্দর সব ছবি চুরি করবো। বাসায় খোজাখুজি করছি আর একটু শব্দ হতেই ভীষণ চমকে উঠছি। এই বুঝি কেউ দেখে ফেললো। বা চলে এলো। যদি কেউ দেখে ফেলে নির্ঘাত আমাকে চোর ভাববে।

অবশেষে অনেক খোজাখুজির পর অ্যালবামটা পেয়ে গেলাম। তারপর বেছে বেছে কয়েকটা ছবি নিয়ে কেটে পড়লাম। ছবিগুলো ছিল খুব সুন্দর। প্রতিদিন লুকিয়ে ছবিগুলো দেখতাম এবং সাবধানে ড্রয়ারে রেখে দিতাম। প্রথম কয়েকদিন ড্রয়ার তালা দিয়ে রেখেছি কিন্তু একদিন যখন তানভীরের সঙ্গে বিকেলে ঘুরতে বের হলাম সেদিন ড্রয়ারে তালা দিতে একদম ভুলে গেলাম। ফিরে এসে ড্রয়ার খুলে ছবিগুলো নিরাপদে আছে কি না দেখতে গেলাম। কিন্তু ছবি উধাও। হায়, বুকটা ঢাকের মতো বেজে উঠলো। সারা দিন আতঙ্কের মাঝে কাটালাম। নিশ্চিত হতে পারলাম না ছবিগুলো কে নিতে পারে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। রাতে যখন পড়তে বসেছি আপু আমাকে বলে গেলেন, যেন তাড়াতাড়ি না ঘুমাই। আমার সঙ্গে তার একটা কথা আছে।

বুকের মধ্যে তখন একশ ঢাক বেজে উঠলো। কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না। কি আর করা আমি পড়া মুখস্থ করতে চেষ্টা করলাম কারণ পরের দিন ছিল আমার ক্লাস টেস্ট। কিন্তু আমার পড়া এক লাইনও মুখস্থ হলো না। একবার ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু সাহস হলো না। দরজা ভেজিয়ে রাখলাম আপু আসবে বলে।

আপু যখন টেবিলে এসে বসলো তখন আমাদের বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আপু ভেবেছিল কেউ হয়তো আমাকে দিয়ে তার ছবিগুলো চুরি করিয়েছে। নিজেই ছবি চুরি করেছি এটা সে ভাবতে পারেনি। সে প্রশ্ন করলো এভাবে ছবিগুলো নিতে তোমাকে কে বলেছে?

বললাম, কেউ বলেনি।

কিন্তু সে আবার জেরা করলো, না তোমাকে কেউ পাঠিয়েছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে। কেউ পাঠায়নি বলে আমি স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। আপু আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমার মনে এক সঙ্গে কিছুটা ভয় এবং লজ্জা উকি দিল। আমাকে আবারো প্রশ্ন করা হলো। তখন লজ্জায় মরে যাচ্ছি। মনে হচ্ছিল যেন পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। অতি ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল। মরে যেতে ইচ্ছে হলো। পারলাম না, লজ্জায় দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললাম। চোখের সামনে হলুদ রঙ খেলা করতে দেখলাম। এক বিচিত্র অনুভূতি হঠাৎ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

আপু তখন আমার অবস্থা বুঝতে পেরে কিছুটা নরম হয়ে বললেন আমি তো তোমার আপু হই, আপুর ছবি চুরি করলে কিছু হয় না। তারপর বললেন, আরে বোকা আমি তো কাউকে কিছু বলবো না তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? মুখ থেকে হাত নামাও।

কিন্তু তখন কোনো কথাই আমার কান দিয়ে ঢুকছিল না। তখনো দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছি।

আপু বললেন, আচ্ছা যাও তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি শুধু মুখ থেকে হাতটা নামাও, আমি চলে যাবো।

আপুর অনুরোধ রাখতে পারলাম না। যেন কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার হাত দুটোকে মুখের ওপর চেপে ধরেছে। এভাবে কতোক্ষণ বসে ছিলাম জানা নেই। আমার কাছে মনে হলো অনেক সময় এভাবে বসে আছি। সে রাতে আপুর সামনে আমি মুখ থেকে হাত নামাতে পারিনি। অবশেষে আপু নিজেই বিব্রত হয়ে ফিরে গেলেন। আমি ঠায় বসে রইলাম। তারপর অনেকদিন চলে গেল। আপু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। প্রথমদিকে বাসা থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসা-যাওয়া করতেন কিন্তু

যাতায়াতের সমস্যা বলেই হয়তো এক সময় হস্টেলে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাকে দেখতে পাবো না বলে বিষণ্ন হয়ে থাকতাম। একদিন সত্যি সত্যি হস্টেলে চলে গেলেন। আপুকে দেখার জন্য আমার মন আকুপাকু করতে থাকে। একদিন হস্টেল থেকে তিনি বাসায় আসলেন। শুনতে পেলাম আগামীকাল হস্টেলে চলে যাবেন। মনে আছে আপু হস্টেলে চলে যাবেন বলে সেদিন রাতে ভীষণ কেদেছিলাম।

তোমাকে কখনো ভুলবো না। তুমি খুব ভালো থেকো। এখন আমাদের বাসার পাশে না থাকলেও তোমাদের বাসা খুব বেশি দূরে নয়। যখন তোমাদের বাসায় যাই তুমি তখন আমাকে এটা খেয়ে যাও ওটা খেয়ে যাও বলে সাধাসাধি করো তখন ভীষণ ভালো লাগে। যদি কখনো বিয়ে করি আর যদি একটা ফুটফুটে মেয়ে হয় তাহলে আমি তার নাম রাখবো তানিয়া। কল্পনা করি আমার মেয়েটা হবে ঠিক তোমার মতো!

সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে

বৃষ্টির কান্না

নুসরাত জাহান নূপুর

কলেজে মাত্র ভর্তি হয়েছি। সরকারি মহিলা কলেজ। বান্ধবী মীরার মাধ্যমে পরিচিত হলাম লিপনভাইয়ের সঙ্গে। তিনি আমার বান্ধবী রীমার খালাতো ভাই। সেদিন স্পৃং কর্নার-এ আমাকে ও মীরাকে নিয়ে কফি খেয়েছিলেন। এর দুসপ্তাহ পর লিপনভাইয়ের সঙ্গে আদালত সড়কে দেখা হলো। তিনি আসছিলেন, আমি যাচ্ছিলাম। আমাকে থামার জন্য ইশারা করলেন। রিকশাওয়ালাকে থামতে বললাম। লিপনভাই এসে বললেন, তিনি নাকি দুই-তিন দিন ধরে আমার খোজ করছেন। অবাক হলাম। লিপনভাইয়ের সঙ্গে তো আমার এমন কোনো প্রয়োজন নেই যার জন্য আমার খোজ করতে পারেন!

লিপনভাই বললেন, আমি যেন দুই-তিন দিনের ভেতর তাকে কিছু সময় দিই।

তাকে সময় দিয়েছিলাম। মঙ্গলবার। ঠিক সাড়ে নয়টায়। স্পৃং কর্নারে।

বান্ধবী শান্তা ও মেরিকে লিপনভাইয়ের কথা বললাম। জানতে চেয়েছিলাম, লিপনভাই কি বলবেন তা কি ওরা আন্দাজ করতে পারছে?

শান্তা জানালো, আন্দাজ করা কঠিন কিছু না। দেখবি তুই গিয়ে বসার পর তোকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি - এ রকম প্রস্তাব দেবেন।

শান্তাকে মৃদু ধমক দিয়েছিলাম। ওর যতো আজগুবি কথা। মাত্র একদিনই তার সঙ্গে কথা হয়েছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম লিপনভাই ও মীরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। তাই শান্তার কথা বিশ্বাস করিনি।

মঙ্গলবার ভোর থেকেই ধুম বৃষ্টি। আমার কান্না পেতে লাগলো। অথচ এটা সাধারণ ব্যাপার। বর্ষাকালে বৃষ্টি হবেই। লিপনভাইয়ের প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। তারপরও কান্না পাচ্ছিল। আমি মন থেকে প্রার্থনা করেছি বৃষ্টি যেন থেমে যায়। ওপরওয়ালা প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল।

সকাল সাড়ে নয়টা বাজার দুই মিনিট আগেই আমি, শান্তা ও মেরি স্পৃং কর্নারে ঢুকলাম। লিপনভাইকে স্পৃং কর্নারের গেটে দেখলাম। আমরা ভেতরে যাবার পর লিপনভাই ভেতরে ঢুকলেন। সবাই এক টেবিলে বসলাম। তার সঙ্গে শান্তা ও মেরির পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি প্রথমেই আমাদের একেবারে ঠিক সময়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

হালকা নাশতার অর্ডার দেয়া হলো। নাশতা আসার পর বলতে শুরু করলেন মীরাকে খুব বেশি ভালোবাসেন তিনি। মীরাও তাকে ভালোবাসে। অথচ গত সপ্তাহ থেকে মীরা নাকি তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না।

লিপনভাই ফোন করার পর বলেছে, তিনি যেন আর কখনো তাকে ফোন না করেন। লিপনভাই বুঝতে পারছেন না তার অপরাধ বা ভুলটা কোথায়। তিনি নাকি মীরার বোন নোভার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, গত সপ্তাহে ইংল্যান্ড প্রবাসী এক পাত্রের সঙ্গে মীরার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। বরপক্ষ কনে দেখে গেছে। কনে পছন্দও হয়েছে।

লিপনভাইয়ের ধারণা মীরার বিয়ে ওই ইংল্যান্ডের পাত্রের সঙ্গে হবে। অথচ মীরা না চাইলে এ বিয়ে হবে না। লিপনভাই ও মীরা নাকি ঠিক করেছিলেন ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করবেন। অথচ মীরা ফোনে বলেছে, লিপনভাই যেন ওকে বিরক্ত না করেন।

লিপনভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে আমি কি করতে পারি?

লিপনভাই জানালেন, তিনি নাকি মীরার কাছ থেকে শুনেছেন আমি আর মীরা খুব ভালো বান্ধবী। আমি যদি মীরাকে লিপনভাইয়ের কথা বলে বোঝাই তাহলে নাকি মীরা তাকে বিয়ে করবে। মীরাকে যে ইংল্যান্ড প্রবাসী পাত্রের চেয়ে তিনি বেশি সুখী করতে পারবেন লিপনভাই সে কথাও জানালেন। লিপনভাই আমাকে খুব অনুরোধ করলেন মীরাকে যেন ভালো করে বুঝিয়ে রাজি করাই। তিনি মীরাকে ফোন করবেন না। ফলাফলের জন্য পরের মঙ্গলবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

লিপনভাই বিদায় নেয়ার পর শান্তা বললো, এ রকম ভালোবাসলে আমার সব ভালোবাসা তাকে দিয়ে দিতাম। মীরা বুঝলো না।

আমার খুব খারাপ লেগেছিল। সে দিনের সকালের মতো কান্না পাচ্ছিল। খুব কাদতে ইচ্ছা করছিল। কেন? এর ব্যাখ্যা আজো বের করতে পারিনি। মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, আকাশ ভেঙে ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামুক। তাহলে কাদতে পারবো। বৃষ্টিতে ভিজলে চোখের পানি আর বৃষ্টির পানি আলাদা করে চেনা যাবে না।

না, সে বর্ষায় লিপনভাইয়ের জন্য কিছু করতে পারিনি। মীরা ইংল্যান্ড প্রবাসী পাত্রকেই বিয়ে করেছিল।

বরিশাল থেকে

ফিরে দেখা

শাহাদাতুল মেরাজ

এইচএসসি-র টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই বাড়ি ছাড়তে হলো। তখন আমরা সরকারি দলের নই। তাই কলেজ ক্যাম্পাসে মারামারিতে জিতলেও শহরে টিকতে পারলাম না। নদীর ওপারের গ্রামে এবাড়ি-ওবাড়ি দুই তিন রাত করে মাস কাটিয়ে দিলাম।

বাড়ি এবং মার জন্য মন আনচান করে। রিস্ক নিলাম বাড়িতেই লুকিয়ে থাকবো। শীতের সুবিধা নিয়ে আপাদমস্তক চাদরে মুড়ে খুব ভোরে সাইকেলে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু এখানেও রাতে থাকার অনুমতি মিললো না। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেই চলছিল রাত যাপন। তার নানাবাড়িতে তাকে দেখে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। এই ভালো লাগা বিস্তার লাভ করলো দ্রুত।

দুপুরে ছাদে বসে তাকে দেখার প্রতীক্ষায় ছিলাম। খুব কাছেই পুলিশের বাশির শব্দে বিপদ টের পেলাম। দৌড়ে পালিয়েও রক্ষা হলো না। দরজার ফাকে তার ব্যথাতুর মুখ দেখলাম। তাকে দেখলাম পুলিশকে খুব বকা-ঝকা করছে। মনটা আমার ভালো হয়ে গেল। থানা হাজতে তার মুখ কল্পনা করেই পার করলাম। জজের মহানুভবতায় সন্ধ্যায় জামিন হয়ে গেল।

রেজাল্ট হলো, ফার্স্ট হলাম। আমার রেজাল্টের খবর, আরো অনেক কথা সাজিয়ে নিয়ে তাকে বলতে গেলাম। সে রিফিউজ করলো। নিজের কাছে খুব ছোট হয়ে গেলাম।

নভেম্বর ১৯৯৯। ইউনিভার্সিটি শেষ করে ভালো একটা চাকরির অপেক্ষা করছি। তাকে দেখলাম আরো অনেক সুন্দর, পরিপূর্ণ। কথা হলো, কেমন আছো, কেমন আছেন এতোটুকুই। আবার সেই ভালোলাগার অনুভূতি। তবে বেশ কষ্ট মেশানো।

ই-মেইল অ্যাড্রেস খুললাম তার নামের প্রথম অক্ষর যোগ করে। অনেক চেষ্টা করেও মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না আগের সেই ইসু নিয়ে তার সামনে দাড়াতে।

প্রথম সারির প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি হলো। সকালে নাশতার টেবিলে বাবা-মা পাকড়াও করলেন, তোর জন্য মেয়ে দেখছি। আমরা মডার্ন বাবা-মা, তোর কোনো পছন্দ আছে কি না বল।

বললাম, টিভি সিরিয়াল দেখে তো ভালোই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পারলাম না তার কথা বলতে।

একদিন বিকেলে হাতে চিরকূট ধরিয়ে দিল মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আসতে। আমাদের আলোচনায় তার স্মার্ট পার্টিসিপেশনে ঘাবড়ে গেলাম। তাদের দিকের এক দুর্ঘটনায় আমাদের বিয়েটা একটু পিছিয়ে গেল।

প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি, মাঝে মাঝেই রাত হয় বাসায় ফিরতে। সে অভিমান করে, অবুঝের মতো। জানি ভালোবাসা তাকে অবুঝ করে দেয়, এলোমেলো করে দেয়। কয়েকবার ডিসিশন নিয়েছি, চাকরি বদলাবো। অবুঝের মতোই। তার খুব ইচ্ছা আমার প্রথম ভালোবাসার সেই মেয়েটিকে দেখবে।

তার নামের প্রথম অক্ষর জুড়ে দেয়া সেই ই-মেইল অ্যাড্রেসটি সেভাবেই আছে। আমাদের অনেক আদরের ভালোবাসার ছোট্ট ছেলেটির নামের প্রথম অক্ষরটিও যে *t*।

meraz_t@yahoo.com

মাইক্রো প্রেম

সজীব

আজকাল ভালোবাসাটা যেন কেমন হয়ে গেছে। বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় তেমনি ভালোবাসা যেন চাইলেই পাওয়া যায়। স্কুল, কলেজ থেকে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েক রকম ভালোবাসা দেখলাম বা বুঝলাম। তারই কয়েকটা এখানে তুলে ধরছি। সঙ্গত কারণেই পাত্রপাত্রীর নাম গোপন রেখে।

যোগ্যতাহীন নাকি অন্ধ প্রেম?

রিনি স্কুলের খুবই মেধাবী ছাত্রী। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত সেকেন্ড হয়নি। সায়েন্সে পড়তো। শাহীন কলেজে এ রকম ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের ব্যাচে আর কোনো মেয়ে বোধহয় চলাফেরা করতো না। সেই কি না সবার অগোচরে প্রেমে পড়লো রাজিনের। রাজিন কমার্সের ছাত্র। চেহারার মাপকাঠিতে হ্যান্ডসাম বা স্মার্টও বলা চলে না। অন্তত রিনির কাছাকাছি তো নয়ই। পড়াশোনায় রিনির উল্টো। অথচ রিনি আর রাজিন? আমরা কোনো সমীকরণেই মেলাতে পারলাম না এ প্রেমকে। অনেক বাধা-বিপত্তি এলেও এখনো কলেজ শেষে তাদের জুটি টিকে আছে। তাদের জন্য শুভ কামনা।

মৃত প্রেম

স্কুলের হ্যান্ডসাম ও একই সঙ্গে স্মার্ট বা ওভার স্মার্ট। ছেলেদের মধ্যে আজিম ছিল অন্যতম। কলেজে ওঠার পর সারাহকে দেখে মজে গেল সে। যদিও সারাহ সম্পর্কে বিশ্ব প্রেমিকা সম্পর্কিত একটা গুজব আমাদের কানে ছিল তবুও আজিম ছিল ড্যাম কেয়ার। দুজনে মিলে ভালোই ছিল কলেজে। এইচএসসি-র রেজাল্টের পর হঠাৎ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার দিন আজিমের সঙ্গে দেখা। সারাহর কথা জিজ্ঞাসা করায় বললো, মারা গেছে সে। ভালোবাসা কি এতোই ঠুনকো?

প্রেম না বন্ধুত্ব?

কাছের বন্ধু রহমান প্রায়ই গর্ব করে বলে, জানিস আমার মেসেঞ্জারে মেয়েদের আইডি ৫০টা পার হয়ে গেছে। গতকাল তার সঙ্গে মোবাইলে এতোক্ষণ কথা হলো। আমার মনে হয় সে আমাকে ভালোবাসে ইত্যাদি নানান কথা। তাকে যদি বলা হয় তুই কাউকে ভালোবাসিস কি না? তখন সে বলবে, নাহ,

ভালোবাসা মিথ্যা। তারা তো শুধুই আমার ফ্রেন্ড। অথচ সে যেভাবে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে সেভাবে হয়তো কোনো প্রেমিকও প্রেমের কথা বলতে পারে না।

ক্রেতা–বিক্রেতা

বন্ধু রাসিফের সঙ্গে অনেক মেয়ের পরিচয়। খরচের ব্যাপারেও সে উদার। তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তুই মেয়েদের পেছনে এতো টাকা খরচ করিস কেন? কি লাভ? সে বলে, দোস্ত, আমি যে শুধু মেয়েদের পেছনে টাকা খরচ করি তা তো এমনি না। টাকাটা খরচ করে তাদের সময় কিনি মাত্র। ওই সময়ের আনন্দটুকুই কিনি। কোনো ঝামেলাই নেই যেন তোর এ থিওরিতে।

প্ররোচনার প্রেম

কলেজে তুহিন আর মুন্নি হঠাৎই যেন প্রেমে পড়লো। ব্যাপারটা প্রথমে নিছক মজা ছিল হয়তো। পরে তা বেশ গভীর হয়। জানলাম, উভয় পক্ষের কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু–বান্ধবীর প্ররোচনাই তাদের প্রেমের বীজ রোপণের কারণ। যথা নিয়মে বছর ঘোরার আগেই তথাকথিত ব্রেকআপ। আসলেই কি এর কোনো প্রয়োজন ছিল?

এবং আমি

আমি যে আসলে কি চাই তা হয়তো জানি না। বন্ধু–বান্ধবদের মাঝে আমি যেন বড্ড সেকেলে। প্রথম দর্শনেই ভালোবাসাটা কেমন যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। দুদিনের জন্য খেলতেও পারি না। মেয়েদের পটানোর মতো চেহারা বা মুখের ভাষা কোনোটাই নেই। মাঝে মধ্যে মনে হয় ভালোবাসাটা যেন কারো সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফালতু আলাপ। *ভালোবাসি* উচ্চারণ না করেও অন্তরের গভীরে ভালোবাসা অনুভব করার মতো। যেন মুখের ভাষা নয়, মনের ভাষা, চোখের ভাষা। এ জন্যই হয়তো স্কুল–কলেজ পেরিয়ে আজ ইউনিভার্সিটিতে পৌছেও কেবল নিজের সেকেলে বিশ্বাসের কারণে কাউকে পাইনি। তবুও দুঃখ কি, আশায় তো আছি! নিরাশার চেয়ে সেটাই তো শ্রেয়। জয়তু ভালোবাসা।

চট্টগ্রাম থেকে
ekamanush@gmail.com

হারানো বৌ

কৌশিক

সময়টা ছিল ২০০২ সালের মাঝামাঝি। আমি দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ি। বটিয়াঘাটা মহাবিদ্যালয়–এ। আমার বন্ধু–বান্ধবীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। আমাদের দলটির পরিচিতি ছিল কলেজ জুড়ে। আমরা সবার সঙ্গে আড্ডা দিতাম খুবই খোলামেলাভাবে। বান্ধবীদের একজনের ছোট বোন পড়তো কলেজের পাশেই একটি হাই স্কুলে। তার নাম ছিল শ্রাবন্তী। পড়তো দশম শ্রেণীতে। তাকে স্কুলে যেতে হতো আমাদের কলেজ গেট পার হয়ে। তাকে চিনতাম বান্ধবীর বোন হিসেবেই। সে কারণেই আমরা তাকে টিজ করতাম না কখনো, যদিও সে দেখতে খুবই সুন্দরী ছিল। একদিন আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে আমার বান্ধবীর সেই বোন শ্রাবন্তীর কথা উঠলো।

হঠাৎ বললাম, তোর বোনকে বিয়ে দিবি আমার সঙ্গে?

বান্ধবী বললো, হ্যা দেবো কোনো আপত্তি নেই।

সেই থেকে শুরু। বন্ধু মহলে আমার পরিচিতি হলো তার দুলাভাই হিসেবে। আমি তাকে শালী বলে ডাকতাম, সেও আমাকে দুলাভাই ডাকতো। এমনকি যখন সে স্কুলে যেতো তখন বন্ধুরা বলতো, ওই দেখ তোর বৌ যায়। আমিও তাদের সঙ্গে হাসি–ঠাট্টায় যোগ দিতাম।

কিছুদিন পর বিষয়টা তার কানেও পৌছে। শ্রাবন্তীরা তিন বান্ধবী সব সময়ই একসঙ্গে থাকতো। তারাও আমাকে নিয়ে শ্রাবন্তীর সঙ্গে ঠাট্টা–তামাশা করতো। শ্রাবন্তীও বিষয়টা বেশ উপভোগ করতো।

আমার বন্ধুরা শ্রাবন্তীকে সামনা–সামনিই বৌদি, মামি বলে ডাকতে শুরু করলো। সে এ সময়টাতে যখনই আমার সামনে এসেছে তখনই আমরা দুজনে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছি। তবুও সে মিটিমিটি হাসতো এবং লজ্জায় লাল হয়ে যেতো আমি সামনে এলেই। ক্রমে বিষয়টা ছড়িয়ে পড়ে পুরো কলেজে এবং তার স্কুলেও। ধীরে ধীরে বিষয়টা বেশ সিরিয়াস হয়ে পড়লো। এতো দিনে আমিও তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। সব সময় তার চিন্তায় ডুবে থাকতাম। যখনই একা থাকতাম তার মুখটাই মনে পড়তো। দেখলাম এভাবে চলতে পারে না।

বান্ধবীদের ডেকে সব কিছু বললাম। বললাম একটা সিদ্ধান্তে আসতে এবং এই নাটকের শেষ টানতে। বললাম, এভাবে নকল বর–বৌ সেজে থাকতে আর ভালো লাগে না। এটাও জানালাম, আমি তার প্রেমে ডুবন্ত প্রায়। তারাও বেশ সহানুভূতিশীল হলো।

শ্রাবন্তীর দিদি বললো, ঠিক আছে, আমি শ্রাবন্তীর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

পরদিন এসে সম্মতিসূচক রায় দিল। তারপর যা হয়, চুটিয়ে প্রেম। প্রতিদিনই দেখা হতো। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো শ্রাবন্তীর এসএসসি পরীক্ষার সময়ে। তখন ২০০৩ সালের মার্চ মাস। প্রতিদিনই যেতাম পরীক্ষার হলে তার সঙ্গে। এ সময়টাতে তার বাড়িতে বিষয়টা জানাজানি হয়। পরীক্ষার পর আমার সঙ্গে দেখা করে বলে, বাড়িতে সবাই জেনে গেছে। এখন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা মানে বিপদ। জানালো বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। এর কিছু দিন পরই জানালো তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। পাত্র ভালো, সম্ভ্রান্ত ঘর। জানতে চাইলো কি করবো।

তখন সামনে আমার এইচএসসি পরীক্ষা। আমি কিই–বা করতে পারতাম। কাপুরুষের মতো বললাম, মা–বাবার সিদ্ধান্তকেই মেনে নাও।

অশ্রুসজল চোখে চলে গেল আমার সামনে দিয়ে। তারপর তার বিয়ে হয়েছে। যতোদূর জানি সে সুখেই আছে।

প্রায় আড়াই বছর পর দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে ২০০৫–এর ডিসেম্বরে। অল্প সময় কথা হয়েছিল, দেখলাম তার হাসিটি তেমনিই আছে। আগের মতোই।

তাকে কাছে পেয়েছিলাম একদিনই। সে দিনটি আমার স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল। দিনটি এলেই অসম্ভব ভালো লাগায় ভরে যায় মন। পরক্ষণেই বিষাদের কালো মেঘে ডুবে যাই। ছোট ছোট কষ্ট বুকে বাজে। একা লাগে নিজেকে খুব। হয়তো সেটা তার জন্যই... নয়তো নয়।

খুলনা থেকে
kaushik.ku@gmail.com

ছবি

মাউদুদা খাতুন

মায়ের কাছে মেয়ে অনুযোগ করলো তার একটি ছবিও ঘরে টাঙানো নেই বলে।

মা দেখলেন, সত্যিই তো মেয়ে সুরাইয়ার কোনো ছবি ঘরে টাঙানো নেই।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা বুঝতে চেষ্টা করলেন ছবি টাঙানোর মধ্য দিয়ে মেয়ে তার ভালোবাসা পরীক্ষা করতে চাইছে কি না। মেয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চেহারা বুঝতে পারলেন না। তবে খুব লজ্জিত হলেন। একটু কষ্ট অনুভব করলেন।

মনে পড়লো সুরাইয়া যখন খুব ছোট তখন তার ছবি তোলা হয়েছিল। একবার তিনি ছবিটি বাধিয়ে বড় মেয়ের ছবির পাশে রাখবেন বলে দোকানে গিয়েছিলেন, সে দোকানটি ততোদিনে উঠে গেছে। তবে তিনি সেই ছোট ছবি থেকে বড় ছবি করেছিলেন। তারপরও ছবিটা বাধানো হয়নি। বড় বোনের সঙ্গে সুরাইয়ার

একটা ছবি বাধানো হয়েছিল। সেটা দেয়ালে টাঙানো ছিল। কিছুদিন আগে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্রেম থেকে ছবিটা খুলে রেখেছিলেন। সেটাও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। খুজে পাননি।

মার মনে খটকা ছিল তিনি কি মেয়েকে অবহেলা করেছেন কখনও। তার মনে পড়লো, সুরাইয়া বয়সের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা ছিল। তার নিজের বোন, খালাতো, মামাতো ভাইবোন, স্কুলের বন্ধুবান্ধব সবার চেয়ে লম্বা ছিল সে। এ কারণে তার ভেতর এক ধরনের হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন মা–ই তাকে মহিলাদের কৃকেট টিমে ভর্তি করিয়েছিলেন। সে সময় মহিলাদের একটা কৃকেট টিম খোলা হয়েছিল। পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সেখানে ভর্তি করে লাভ হয়েছিল, যে সুরাইয়া লম্বা হওয়ার জন্য সব সময় বিব্রত বোধ করতো, কৃকেটে লম্বা মেয়ের চাহিদা দেখে লম্বা হওয়াটাও যে কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরি সেটা বুঝতে পেরে তার হীনম্মন্যতা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাচ্ছিল। তখন থেকেই সে নিজের প্রতি মনোযোগী হলো।

সুরাইয়াকে যখন ড্রাইভিং শেখানোর কথা বলা হলো, তখন খুব খুশি হয়েছিল সে। যখন ড্রাইভিংয়ের সব পরীক্ষায় দক্ষতার সঙ্গে পাস করলো এবং এক চান্সেই সে জিগজাগেও সাফল্য দেখালো তখন তার আনন্দ দেখে কে! মা খুশি, বাবা খুশি আর মেয়ের খুশিতে খুশির বন্যা বয়ে গেল সারা বাড়িতে।

নতুন ভোটার হয়ে যখন ভোট দিল তখনো সে খুব খুশি হয়েছিল। বলেছিল, আজ মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশের একজন গর্বিত নাগরিক। নতুন পাসপোর্ট পেয়েও সে একই অনুভূতি প্রকাশ করেছিল।

বড় মেয়ের আগেই সে গ্র্যাজুয়েট। এ আনন্দে তার বাবা যখন পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়েছিলেন তাও তাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল।

আসলে অল্পে তুষ্ট হওয়া মেয়ে সুরাইয়া সব কিছুতেই আনন্দ পেতো। কোনো জিনিস, সেটা জামা হোক বা অন্য কিছু তাকে দিলেই সে মহা খুশি।

আমার জন্য এনেছো? উত্তর হ্যা হলে তার খুশি দেখে কে! যখন মোবাইল সেট কিনে দিলেন বাবা আর বললেন ওটা তোমার তখন তার উপচে পড়া খুশি দেখে নীরব থাকাই ছিল মুশকিল। তার আশপাশের সবাইকে সে ভাসিয়ে নেয় তার খুশির স্রোতে।

বাবা–মার ম্যারেজ ডে, মা দিবস, বাবা দিবস, বাবার জন্মদিন, মা–র জন্মদিন সবই তার মুখস্থ। একটা কিছু করে সবাইকে চমকে দেয়া তার চাই–ই। একবার বাবা–মার ম্যারেজ ডেতে সুন্দর একটা টেবিল ল্যাম্প উপহার দিল। টেবিল ল্যাম্পটি আবার সেভেন ইন ওয়ান। তার সঙ্গে টেলিফোন, ফটোফ্রেম, মিউজিক, কলমদানি, আয়না, গয়না রাখার জায়গা এবং সুন্দর একটি ঘড়ি। খুবই সুন্দর জিনিস। আবার মা দিবসে মাকে দিল শরৎ রচনাবলি। বাবা দিবসে বাবাকে দিল সুন্দর একটা বেল্ট। এ সব কিছুই করতো তার জমানো পয়সা দিয়ে।

আসলে সে ছিল একটা ব্যাংক। সবাই তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক বলে ডাকতো। তার কাছে টাকা চেয়ে বিফল হয়েছে পরিচিতদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না। বন্ধুদের ক্ষেত্রেও সে ছিল দরাজ দিলের মানুষ। তাই বন্ধু মহলে সে ছিল সবার প্রিয়। বন্ধুদের খুশিতে খুশি। আবার বন্ধুদের দুঃখে সমান দুঃখী হওয়া বন্ধু মহলে তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। স্বভাবের কারণেই সবারই প্রিয় ছিল সে। সবাই ভালোবাসে তাকে। সেই ভালোবাসার মানুষটিকে তার ভাইবোনরা আদর করে ডাকে *লম্বুজি* বলে। আর প্রত্যুত্তরে হাসি দিয়ে সুরাইয়া তাদের *টিংকুজি* বলে ডাকে। কারণ সবাই তার চেয়ে উচ্চতায় ছোট। তাই সবার থেকে তাকে সহজেই আলাদা করা যায়।

কাজের ক্ষেত্রেও লম্বুজি সুরাইয়ার আলাদা একটা মর্যাদা ছিল। যে কাজ করতে সবাই হিমশিম খেতো সে কাজ সহজেই করে দিতে পারতো। দেয়ালে পেরেক ঠুকতে কষ্ট হলে, দরজায় পর্দা লাগাতে হলে, ওপর থেকে কিছু নামাতে হলে, ছবি টাঙাতে হলে সুরাইয়াকে ডাকা হতো আর সুরাইয়া হাসতে হাসতে অবলীলায় করে দিতো সেসব। টুকিটাকি মেরামতের সব কাজও সে স্বচ্ছন্দে করে দিতো। কখনো কাজে বিরক্ত হতো না।

যখন সে খুব ছোট, একবার স্কুল থেকে ফেরার সময় একদল ছোট ছেলে যারা *টোকাই* নামে পরিচিত, রাস্তায় কাদা পানিতে খেলছিল। সুরাইয়া তা দেখে বললো, *বাসায় গিয়ে দেখ মায়ের হাতে কেমন মার খাও*। টোকাইদের প্রতি নিজের মতো একই অনুভূতি দেখে সুরাইয়ার সরলতায় মা কষ্ট পান। তিনি মেয়েকে বোঝাতে পারেন না টোকাইদের কষ্টের জীবনের কথা। তাদের সঙ্গে পার্থক্যের কথা। আসলে অতো সরল অন্তরের মানুষের কাছে সবকিছু বলা কখনো সম্ভব হয় না। বড় হয়েও সেই সরলতা সুরাইয়ার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

সেই সুরাইয়ার বাধানো ছবি আজ তার হাতে। তিনি দেয়ালে পেরেক ঠুকছেন কিন্তু পারছেন না। তার হাত ব্যথা করছে। সুরাইয়ার কাজ তাকেই করতে হচ্ছে। সুরাইয়া কি দেখছে! কি অনুভব করছে? সুরাইয়াকে মা তো ভালোবাসেন। ভালোবাসা তো অনুভব করার জিনিস। আজ সুরাইয়ার ছবি টাঙিয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে সুরাইয়াকে তিনি সত্যিই ভালোবাসেন।

অথচ সুরাইয়া তাকিয়ে দেখছে না বা সুরাইয়া এসে পেরেক ঠুকতে তার মাকে সাহায্য করছে না। ছবিটি টাঙাতে মা-র বড় কষ্ট হচ্ছে তবুও একাই কাজটি করছেন তিনি।

কারণ সুরাইয়া নেই। সে চলে গেছে পরপারে। সে কোনোদিনই দেখবে না তার দেয়ালে টাঙানো ছবি। তার মা কোনোদিনই সুরাইয়ার কাছে ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন না। আজীবন সুরাইয়ার মাকে সে কষ্টটা বুকের মধ্যে লালন করতে হবে।

পল্লবী, মিরপুর ঢাকা থেকে

ভেতর ঘরে আগুন

কথা বলার স্বভাব আমার তুলনামূলকভাবে কম। কাজে বিশ্বাসী আমি প্রায়ই বাকা কথার মুখোমুখি হই আশপাশ থেকে। আমি বিশ্বাস করতাম শুদ্ধতায়, অন্যকেও সেভাবে দেখতাম। কিছু অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক অদেখা বাস্তবতাকে আমার সামনে নিষ্ঠুরভাবে তুলে ধরেছে।

কাজের সূত্রে আদৃয়ানা আমার সামনের চেম্বারে বসে। খোদা তাকে কোনো দিক দিয়ে অপূর্ণ রাখেনি। আমাদের টপ বস থেকে এন্ট্রি লেভেল পর্যন্ত সবাই তাকে কামনা করে আর সে-ও এর ফায়দা আঠারো আনা আদায় করে। ফলস্বরূপ অনেক শেডিউল ডে সে নন-শেডিউল পেয়ে যায়।

কমপিউটারের মনিটর কিংবা কাজের দিকে আমার বেশি মনোযোগ যেন তার সম্মানে আঘাত হানার মতো। সামান্য একটা বাঙালি ছোকরা দিনের টু-থার্ড সময় কি না ওর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে না অথবা একটা ডেট কামনা করে না কিংবা ডেট পাওয়ার আশায় নিয়মিত লাঞ্চ খাওয়ায় না, এটা তো মানহানিকর বিষয়।

আমি আমেরিকায় নতুনই। তাই এ সমাজের অনেক কিছুই আমার কাছে নতুন কিংবা অবগত নই। দেশে থাকতে যে আমাকে বন্ধুরা বোম্বের হিরোদের সঙ্গে তুলনা করতো সেই আমি এখানে এসে দেখি আমার ত্বকের রঙ আসলে কোনো দিনই ফর্সার কাছাকাছি ছিল না। ওটা আসলে ফ্যাকাশে কালচে তামাটে রঙ। মেয়েদের সৌন্দর্য বলতে যে আমি বুঝতাম সুন্দর মুখশ্রী, পরিমিত স্বাস্থ্য আর লম্বা মেয়ে, সেই আমি এখানে এসে দেখলাম সংজ্ঞাটা ভিন্ন। সুন্দর ফিগার হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রথম মাপকাঠি। হিপ-বুক-কোমর যার যতো বেশি সেক্সি চাহিদার প্যারামিটারে সেই সবচেয়ে ওপরে।

আদৃয়ানা তেমনই একজন যার কোনো দিকে কমতি নেই। বুক যেন টপস আর বক্ষবন্ধনী ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। নাভি অঞ্চল দুই হাতের গ্রিপের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর হিপ যেন সমুদ্রের ঢেউ। স্বতন্ত্র কিংবা সামগ্রিকভাবে তার মুখটা এমনই আকর্ষণীয় একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে হবে না, চোখই চলে যাবে তার দিকে।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি এশিয়ান-বাংলাদেশি মুসলমান টুইন টাওয়ার ভাঙনকারী মুসলিম যারা আমেরিকানদের জন্য হুমকিস্বরূপ। আর বর্ণবাদী শাদা আমেরিকানদের নাক কুচকানো বর্ণের

পোলা। সুতরাং আমি ওই সৌন্দর্যের দিকে তাকাইও না। এজন্যই আদৃয়ানা আমাকে উত্যক্ত করে বেশি। মানুষ যখন বেশি পপুলার হয়ে যায় তখন বোধহয় এক ধরনের অহংকার জন্ম নেয় যে সবাই আমাকে পূজা করবে– তুমি আবার কে হে – পাত্তা দেও না। সম্ভবত এই বোধ তার মাঝে কাজ করছিল আর সে জন্যই সে বক্রোক্তি করে বাঙালিরা নাকি কাপুরুষ। তারা সেক্স করতে জানে না। তারা নপুংশক। মেজাজ বিগড়ে গেলেও কন্ট্রোলে রাখি কারণ সে সরাসরি আমাকে বলে না। জেকুইলিনের সঙ্গে গল্প করে আমাকে শুনিয়ে। দুটি নারী আমাকে নিয়ে আমার জাতিকে নিয়ে হাসাহাসি করে। একদিন সে সরাসরি আমায় আক্রমণ করলো, আমেরিকার যুগোশ্লাভিয়া অ্যাটাকের মতো। আমার নাকি ওটা নাই সেজন্য পচিশ বছর ধরে গার্লফ্রেন্ড ছাড়াই থাকি।

আমি কন্ট্রোল হারালাম। বাঙালি জাতি আমাকে প্রতিনিধি বানালো। তার বিলাসী অ্যাপার্টমেন্টে দেড় ঘণ্টা জার্নির পর সে কাতর কণ্ঠে বললো, আই অ্যাম অল রেডি ওভার টুয়াইস। আই ক্যান্ট ক্যারিং এনিমোর।

চোখ বুজে থাকা আদৃয়ানা জড়িয়ে ধরে বলে, ইউ আর মাই ম্যান, ইউ আর দি বেস্ট।

ফিরে এলাম ঘরে। কি করলাম আমি? হায়, এ আমি কি করলাম! অন্তরে জ্বলন্ত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, আমি এ কিসের প্রতিনিধিত্ব করলাম, জাতির, নাকি চরিত্র হারানোর?

পরদিন থেকে লক্ষ্য করলাম অফিসের সব নারী বিশেষ দৃষ্টিতে অবলোকন করছে আমাকে। আমি আগের মতোই সীমানার ভেতরে খোলসবন্দী হই। আদৃয়ানা আমন্ত্রণ জানায় প্রতিটি উইকএন্ডে। আমি এড়িয়ে যাই। কিছু দিন পর আমাদের পাচটি ব্রাঞ্চের বোর্ড মিটিং। আমি অপেক্ষাকৃত নতুন। একমাত্র বাঙালি। মিটিং শেষে আমার বস শ্রেণীর তিনজন মহিলার কৌতূহলী দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হলো। তাদের নাম শুনেছি। পরিচিত হতে পেরে ভালো লাগছিল। কিন্তু অস্বস্তি লাগছিল তাদের কৌতূহলী দৃষ্টির জন্য। তাহলে কি সবাই জেনে গেছে? হয়তো। হয়তো বা কেউই জানেনি, আমিই অস্বস্তিতে ভুগছি।

হঠাৎ একদিন কেইট গৃর–এর সঙ্গে দেখা। ছত্রিশের পূর্ণ যৌবনা। আমি ভেবেছিলাম ছাব্বিশ। সেই তিনজনের একজন। একটা ভেরিফিকেশনের কাজে ওদের ব্রাঞ্চে গিয়েছিলাম। তার চেম্বারে অনেক আলাপ হলো। জব রিলেটেড। পার্সোনাল লাইফও চলে এলো। আমি সপ্রতিভ। সনি আমেরিকার একটা প্লান্ট ভিজিট আছে। চারজনের গ্রুপ যাবে পেনসিলভেনিয়া। তুমি কি আগ্রহী? কেইট জানতে চান।

প্লান্ট ভিজিট শেষ। হায়াট রিজেন্সি হোটেলের লবিতে কেইট আমার পাশে দাড়ালেন। তার ত্বকের সুগন্ধ পাচ্ছি এমন কাছাকাছি তিনি দাড়িয়ে। লাইটের আলোয় তার নগ্ন বাহু আর বুকের খাজ আমাকে আহ্বান জানায় নেশার জগতে। আমি সংযত। আমার চেয়ে কতো সিনিয়র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এ রীতি তো উল্টো – জুনিয়র বয়ফ্রেন্ড কিংবা হাজব্যান্ড একটা ক্রেডিট। কেইট যৌনতা ব্যাখ্যা করেন ফ্রয়েডের মতো। পাচটা মৌলিক চাহিদার একটি হচ্ছে সেক্স। তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। ভিন্ন রেস্টুরেন্টের ভিন্ন স্বাদ। টেস্ট লাইফ অ্যান্ড এনজয় লাইফ। আমি সারা রাত কেইট নামক রেস্টুরেন্টের অলিগলি চষে বেড়াই। লাইফ টেস্ট অ্যান্ড এনজয় করি। কেইট আমায় দারুণ এক খ্যাতি দিলেন, তুমি আমার দেখা সেরা পুরুষ।

কতো পুরুষ দেখেছেন আপনি।

কেইট হাসেন, ডজন তো হবেই! তবে তোমার সবকিছুই ছিলো পারফেক্ট, অঙ্গ সংস্থান বলো আর টেকনিক বলো।

অফিসের নারী মহলে এই খ্যাতি কি করে পৌছলো জানি না। তবে বুঝতে পারি সত্তর ভাগ মহিলা অপ্রয়োজনেও হাসেন, কথা বলেন। বাকি ত্রিশ ভাগের একটা বড় অংশ ভেতরে ভেতরে কামনা করেন। তবে প্রেস্টিজ বা চরিত্রের দৃঢ়তা কিংবা বর্ণবাদের জন্য তা প্রকাশ করেন না। কেন জানি আমার ভেতর জন্ম নেয় এক অদ্ভুত ফিলিংস, যা শ্রেষ্ঠত্ব, আনন্দ অথচ নৃশংসতার সংমিশ্রণ। কে যেন বলেছিল, শামুকের ভেতর ভাত রেধে খাওয়ার খবরও চাপা থাকেনি আর আমি তো তথ্য প্রবাহের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে ক্ষুধার্তের ক্ষিধে মিটিয়েছি। এরপর কি হলো জানি না, মিস্টার মেশিন খ্যাত এই আমি বিবর্তনের খেলায়

মেতে উঠলাম। নারী দেহতত্ত্বে এতো যে কেমিস্ট্রি বিরাজমান আমি সে আবিষ্কারে মেতে উঠলাম। এক সময় এই খবর ঘরেও (বাঙালিদের কাছে) পৌছলো।

ইরানি বালিকা যেন মরুচারিণী... হায় নজরুল তুমি কি জানতে কাটাইউন কেইজিজির যৌবনে মরুর হাহাকার! আমি যখন আরব সাগরের ঢেউ হয়ে এই উর্বশীর সাড়ে পাচ ফিট যৌবনকে ভেজাচ্ছিলাম তখন তার ছোট এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টটি আমার ডিনারের রেস্টুরেন্ট হয়ে উঠছিল। তার সুধা পানে অন্ধ আমি ডিসিশন নিয়েছিলাম, এ জীবনে যদি বিয়ে করি তাহলে ইরানি রমণী, যেমন তার দেহতত্ত্ব, তেমনি তার রান্নাতত্ত্ব। অথচ এ আমি কি জানতাম স্টেট ইউনিভার্সিটির মিড-ব্যাচেলরে অধ্যয়নরত ইয়েমেনি বালিকা খাদিজা এ পৃথিবীর অপ্সরা। খাদিজা বলেছিল, বাসর রাতে তার ভার্জিনিটি টেস্ট হবে শাদা বিছানার চাদরের ওপর সঙ্গম করে। স্বামী যদি রক্তাক্ত বিছানা না পায় তাহলে সকালে হয় সে বাবার ঘরে নতুবা যমের ঘরে। যদি স্বামী বেচারা নেহায়েত ভালো মানুষ হয় তাহলে তার মা-বাবাকে অপমান এবং বিয়ের সম্পূর্ণ খরচ মুক্তিপণ দিয়ে ওকে রেখে দেবে বৌ করে।

আমার চিন্তিত মুখ দেখে খাদিজা অভয় বাণী শোনায়, ডোন্ট ওরি হানি। আমার বাসর রাতের ডেট হবে আমার পিরিয়ডের দিনে।

ও জানতো ওর বাবা-মা কখনোই সোসাইটির বাইরে যাবেন না। তাই দুঃখ করে বলেছিল, কেন যে তুমি ইয়েমেনে অথবা আমি বাংলাদেশে জন্মালাম না!

আমি সেই দুঃখ ভুলি হাওয়াই যেতে যেতে ক্রুজের কেবিনে। পনেরো দিনের অবকাশ যাপনে পাঞ্জাবের শর্মিলা আমাকে দেখিয়েছিল ভারতীয় নারীর সেরাটা। চাদিমায় মোড়ানো স্বচ্ছ জলে সাতার কাটা শিপের ডকে শর্মিলা শুনিয়েছিল কনভার্ট হওয়ার কথা আর পাঞ্জাবিরাই একমাত্র ভারতীয়, যারা বাংলাদেশের এবং বাঙালিদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে কথা।

কিন্তু বঙ্গ কন্যা মৌমিতা ততো দিনে পদার্পণ করেছে আমার জীবনে। মৌমিতা হচ্ছে সদ্য হাই স্কুল (টুয়েলভ) পেরুনো ঝরনাধারা, যে সব কিছু ভেঙে নিয়ে যাবে বিনাশী আগ্রাসনে আর আমি ততো দিনে বিশ্বজয়ী নাবিক কলম্বাস। তাই আমার কাছে সে বরফের পাহাড়ে স্কেটিং করার মতো। আমি আর মৌমিতা তাই মাঝে মাঝে এক হই রাতের শামিয়ানায় তার পেছন দরজা দিয়ে ঢোকা বেডরুমে।

একদিন রওনক ভাবী বলেন, মৌমিতার কাছে আপনার গল্প শুনেছি! আমি তাজ্জব। ভাবী বলেন, একদিন বেড়াতে আসুন না। জেনেটিক্সে গ্রাজুয়েশন করা রওনকের ছোট সংসার। স্বামী বাংলাদেশের বহুজাতিক কম্পানিতে আছে। এমন সুদর্শনার কথায় মাতাল হাওয়ার ঘ্রাণ পাই। তারপর...। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী রওনক ভেসে যান। আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যান জেনেটিক্সের এডোনিন-গুয়ানিন বন্ধনীতে।

মাঝে মাঝে পাশের পার্কে বসি। সামারের উইকএন্ডে চাদের আলোয় ভাবতে থাকি এ জীবনকে নিয়ে। কেইটের মৌলিক চাহিদা তত্ত্ব যদি ঠিকই হয় তবে হৃদয়ে হাহাকার কেন আমার। এই এতো নারীর একজনও কি আমায় ভালোবেসেছিল? হ্যা, খাদিজা বোধহয় বেসেছিল। কে যেন বলেছিল আমেরিকায় নারী পেতে হলে দুটি জিনিসের একটি হলেই হলো, টাকা অথবা যৌন শক্তি।

একাকী পূর্ণিমা আমায় দগ্ধ করে। আমি তো বাংলাদেশের বোয়িং বিমানের মতো ফুল শেডিউলে ফ্লাইট দিচ্ছি আর বছর শেষে লোকসানের খাতায় নাম ওঠাচ্ছি। তবু এই আমি কি জানতাম সুন্দর মুখের আড়ালে প্রতিটি নারীর জীবনে যৌনতার হাহাকার বিরাজমান? জানতাম না। কে জানে, বুকের ভেতরে তৃষ্ণার আগুন জমিয়ে জীবন হয়তো সুখের স্রোতে পাল তোলে না। আমার হয়তো জানার এখনো অনেক বাকি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আমেরিকা থেকে
purnimai_eka@yahoo.com

পাপ

একেএম আহসান উল্লাহ

আমাদের পাশের বাড়ির আবদুল হাকিমের ছেলে শাহিন। আমার বেলুন খেলার সাথী। এ খেলায় তার সঙ্গে আমি কখনোই পেরে উঠিনি। কারণ তার ঘরে আছে প্র্যাকটিসের উপকরণ। আমার নেই। তার বাবা পরিবার পরিকল্পনা কর্মী। আশির দশকের গোড়ার দিকে তাদের সন্তানরা কনডম দিয়ে বেলুন বানিয়ে আকাশে ওড়াতো। প্রতিযোগিতা হতো। আমিও এ জাতীয় প্রতিযোগিতায় শামিল হই বহুবার। কে জানতো পৃথিবীতে জীবন প্রবাহ বন্ধে এই বেলুনের এতো ভূমিকা।

একদিন শাহিন আর আমি যখন বেলুন খেলার প্রতিযোগিতায় মত্ত তখন পকেট থেকে সে এক পাতা মায়াবড়ি আবিষ্কার করে। ভ্রূ কুচকে ছুড়ে ফেলে। এটা আবার কেন? পতিত জিনিসটার ওপর আমার আগ্রহ হয়। তার অলক্ষ্যে আমি যতনে সংরক্ষণ করি।

এ সময় মায়াবড়ি কিংবা কনডমের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। ধর্মীয় অন্ধত্বের কারণে বিনামূল্যের এ সামগ্রী কারো কাছে পৌছে দেয়া যেতো না। পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি ও কনডম বণ্টন না করেই বেতনভাতা তুলতেন।

এগুলো বিধর্মীরা ব্যবহার করে। মুসলমানরা সন্তান জন্ম দিয়ে যাবে আর আল্লাহ তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। আল্লাহর মাল বলে কথা!

সময় পাল্টে গেছে। এখন সিটি কর্পরেশনের লোকেরা নর্দমা পরিষ্কার করে আবর্জনা রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। আবর্জনার মাঝে দেখা যায় অসংখ্য ব্যবহৃত কনডম। কোনোটা গিড়া দেয়া, কোনোটা খোলা। কাকেরা ঠুকরে ঠুকরে সেই গিড়া খোলে আবার পুরোটাই নিয়ে উড়ে যায়। আমরা যা চুষে বেড়িয়েছি তা বেলুন নয়, কনডম। ওয়াক!

প্রায় দুই দশক পরে স্মৃতি আমাকে নিয়ে যায় পেছনে। বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকাল কলেজের বুক চিড়ে যে ছোট্ট খালটি কীর্তনখোলায় মিশে গেছে, সেই কীর্তনখোলা আমাকে দিয়েছে স্মৃতি সম্ভার। স্যালাইনের খালি ভাসমান প্যাকেট, তুলা, ওষুধের খালি প্যাকেট, ব্যান্ডেজ ও সঙ্গে গিড়া দেয়া কনডম। ছোট ছোট মাছ এ কনডমগুলো ঠেলে কীর্তনখোলায় নিয়ে যায়। কনডম আর মাছের খেলা দেখে বেলা যায়। মুয়াজ্জিনের একের পর এক আজান ভেসে আসে, ভেসে যায়। সেই স্মৃতির মালা আমার শৈশব, কৈশোর, ভালোবাসা, অপমান, কষ্ট, চোখের জল ও মায়াবড়ির মায়া সবই দোলা দেয়। আমি কেপে উঠি আজো।

ধর্মান্ধ এক পরিবারে জন্ম। বেগানা পুরুষ আর নারীর দেখা-সাক্ষাৎ হারাম, এটা জেনেই বড় হই। ধর্মের দেয়াল পেরিয়ে কাউকে ভালোবাসা নিবেদন করা সকলের চিন্তার অতীত। তাই ঘটে যায়। ভালোবাসার মতো গর্হিত কাজটি করে চোদ্দ গোষ্ঠিকে নরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। তা পরিবারময়, পাড়াময় জানাজানি হয়ে যায়। সুরক্ষিত মায়াবড়ির পাতাটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ধর্মীয় আলোকে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে।

ছি! ছি! হুদা তো দেহাই করে নাই, হারামিও (যৌনাচার) করছে। দেহ না মায়াবড়ি রাখছে।

হ, ছি! ছি!

আসমানি লানত নামবে দেহিস...

একদিকে মেয়েটাকে বন্দী করা হয় চার দেয়ালে আর আমি হই নির্বাসিত। বিচ্ছেদে কাতর। অহর্নিশ অপমান আমাকে দিকভ্রান্ত করে তোলে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট আমি। নিজের ওপর অভিমান হয়। শাহিনের ওপর রাগ হয় আমার। এই পতিত পাতাটি পরিবারের একমাত্র কর্ম পরচর্চায় আরো রসদ জোগায়। চারদিকে হা হা, হি হি, বাকা চোখ ও উপহাস। নিজ পরিবারে স্থান হয় না, আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ থাকে না। সবার মুখে একই কথা- আসমানি বালা নামবে এই বাড়িতে।

পুওর মি!

একটি মায়াবড়ির পাতা আমাকে কতোভাবে অপমান করে। তারা নারী। তারা ভালোভাবেই জানে একটা ছেলের কাছে অক্ষত, অব্যবহৃত বহু পুরনো সংরক্ষিত একটা মায়াবড়ির পাতা কিছুই ব্যাখ্যা করে না। অথচ তা আমার মাথায় ঢোকে না। যে বাদ্য তারা বাজায় তার উদ্দেশ্য নিতান্তই আলাদা। তা ভেবে দেখা হয় না আমার।

পনেরো বছর বয়স। তখন শুধু ভালোবাসাটাই জানি। দৈহিক কোনো প্রয়োজনের কথা বুঝি না। গোপনে কতো কথা হয়, দেখা হয়। অথচ একবারো তার হাত ধরে বলা হয় না কিছু। এই প্রতিবাদকারীদের সন্ততিরাও আজ ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসার গল্প আমার কানে আসে। তারা আমার মতো নির্বোধ নয়। তারা ভালোবাসে। ভালোবাসার ফসল বুনে দরিদ্র গৃহপরিচারিকাদের ক্ষেতে। ভালোবাসার ফসল ওই মেডিকালে অ্যাবোর্ট করায়। ফিটাস ভেসে যায় সরু খাল দিয়ে কীর্তনখোলার জলে।

সব উপহাস মেনে নিতে এতো কষ্ট হতো না যদি হাত ধরার পাপটিও একবার করে নিতে পারতাম। একটা চুমু দেয়ার প্রলয়ংকরী কিংবা জঘন্য কাজটি করে নিতে পারতাম। যদি দেখতাম তারা আজো সমান সোচ্চার সব অনাচারের বিরুদ্ধে। অথচ তারা আজ শুধুই দর্শক। কীর্তনখোলাও আজ যৌবন হারিয়েছে। আগের মতো আর গর্জে না। সে–ও সব অনাচার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

আমার ভালোবাসার কীর্তনখোলা বড়ই সরু হয়ে গেছে। কীর্তনখোলার পাড়ে আদম আলী হাজীর ইটের ভাটার চিমনির ধোয়ার কুণ্ডলি চোখে পড়ে না। তার বুকে জেগে ওঠা চরে স্টিমার, ট্রলার আটকে থাকে রাতভর। স্মৃতিভরা খালটিও শুকিয়ে গেছে। নলছিটি ও কাউয়ারচর থেকে আসা কোনো মাঝি নৌকা ভেড়ায় না। মাছরা আর খেলে না সেখানে। মেডিকাল কলেজের বর্জ্য ভেসে নামে না কীর্তনখোলার জলে।

ওই কীর্তনখোলা গর্জে উঠুক, ধুয়ে নিক অনাচার, অন্ধত্ব। পৌছে দিক আলো। এই মুমূর্ষু কীর্তনখোলা কি জেগে উঠবে একদিন?

মাদ্রিদ থেকে
akmahsanullah@gmail.com

ত্রয়ী

লিটল অ্যানজেল

সে ছিল আমার লিটল ফ্রেন্ড। ফোনে হয়েছিল অসম বয়সের দুটি মানুষের এই বন্ধুত্ব। পরিচয়ের সময়টাতে সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, আর আমি পচিশ। বয়সের ব্যবধানটা বন্ধুত্বের জন্য যথেষ্ট অনুকূল ছিল না। তবুও হয়েছিল, কারণটা বোধহয় দুজনেরই নিজের কথা বলার একজন সঙ্গী প্রয়োজন ছিল।

আমার সেই সময়ের নিঃসঙ্গতা সে অনেকখানিই ভরিয়ে তুলেছিল তার কৈশোরের চপলতা আর উচ্ছ্বাস দিয়ে। বেশির ভাগ সময় বলার ভারটা সেই নিতো। আমি ছিলাম মনোযোগী শ্রোতা। কম বলার অভিযোগ পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম লেখায়। দুজনেরই লেখায় থাকতো নানান কথা, হেয়ালি, মান–অভিমান আর মান ভাঙানোর চেষ্টা। নিজের তাগিদেই তাকে মাঝে মধ্যে আমাদের বয়সের পার্থক্যটা মনে করিয়ে দিতাম। তবে সে এ ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত ছিল না। ফোনে সম্বোধন বিহীন আপনি আর তুমির আলাপ গড়িয়ে যেতো অবিশ্রান্ত রেলের চাকার মতো। ছন্দ ছিল, ছিল ছন্দপতন। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করেই বিরতি নিতাম। বুঝতাম, সে কষ্ট পেতো। তবুও নিতাম। এই বিরতিটুকু আমার নিজেকে বুঝতে সাহায্য করতো।

আশ্চর্যজনকভাবে দুজনের কেউই কখনো মুখোমুখি হবার কথা বলিনি। সে মনে মনে ভেবেছিল কি না জানি না, তবে আমি ভাবিনি। এ বন্ধুত্বটুকু নিয়েই খুশি ছিলাম আর সত্যিকার বন্ধুত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধও সেই তৈরি করে দিয়েছিল। তার পরিবারেও আমাদের বন্ধুত্বটা বাধা পায়নি কখনো।

তার মা একবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে শুধু বলেছিলেন এই বয়সটাতেই মেয়েদের মন দুর্বল থাকে। তাকে আশ্বস্ত করেছিলাম। সেই সঙ্গে নিজেকেও সাবধান করে দিয়েছি বার বার।

ঘটনাক্রমে আমাদের দেখা হলো এক সময়। তবে বন্ধুত্বের মাঝে তার কোনো প্রভাব পড়েনি কখনো। দ্বিতীয়বার যখন আমাদের দেখা হলো, তখন গিয়েছিলাম তাদের সবাইকে আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। সবাই খুশি হয়েছিল। এসেছিলও সে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে।

বিয়ের পর আমি এক পরিপূর্ণ সুখী মানুষ। উপচেপড়া সুখের সমুদ্রে ভাসছি। অনাঘ্রাত ভালোবাসার স্বাদ আমায় সিক্ত করেছে। সেই প্রবল ভালোবাসা আমার এতো বছরের জীবনে ভালোবাসা না আসার সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে।

তার সঙ্গে যোগাযোগ কমে গিয়েছিল অনেকখানি। মাঝে মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথা হতো। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তার কথা হতো। এক সময় বুঝলাম ভালোবাসার একান্ত জনকে সবকিছু শেয়ার করা যায় না। আমার স্ত্রীর কাছে সে অনভিপ্রেত। আমি আমার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ রাখতে চাইনি। তৃতীয় এবং শেষবার যখন তার সঙ্গে দেখা হলো, তখন পালিয়েই আসতে গিয়েছিলাম। মুখে বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারিনি। একটা কার্ড আর ছোট চিঠি দিয়ে বলেছিলাম, আমি যাওয়ার পর খুলো।

সেদিন সে কমপিউটারে নিজে রেকর্ড করা খালি গলায় গাওয়া একটা ইংরেজি গান শুনিয়েছিল। যার অর্থটা অনেকটা এ রকম :

যদি খানিক আগে নিজেকে বোঝানো যেতো তবে হয়তো তুমি আমার হতে পারতে।

জানি না সেটা কি শুধুই একটা গান ছিল, না কি ছিল তার মনেরই কথা।

আমাদের দুজনেরই চিঠি বা কার্ডে থাকতো Friends Forever হওয়ার আকুতি। আমি নিজেই পারিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। এজন্য ভীষণ অপরাধবোধে ভুগি। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝি ভালোবাসা বাচিয়ে রাখতে কখনো হয়তো কিছু প্রতিশ্রুতি ভুলতে হয়। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বড় কষ্টের। তবুও থাক না এই কষ্টটুকু শুধু আমারই।

ভালোবাসার দিনেই ছিল লিটল অ্যানজেল-এর জন্মদিন। সে খুব ভোরে ফোন পেতে পছন্দ করতো। সে কি জানে ভালোবাসা দিনের সূর্য না ওঠা ভোরে কথা না বলা যে ফোনটা সে পায়, সেটা আমারই?

ভালোবাসার নদী

গভীর রাত। লো ভলিউমে শ্রেয়া ঘোষালের গান বাজছিল। একটা চ্যাট রুমে লগইন করা ছিল আর আমি চেষ্টা করছিলাম একটা ডিজাইন দাড় করাতে। হঠাৎ একটা Chat window ভেসে উঠল : Hi.

দায়সারা উত্তর দিলাম : Hello.

অভিজ্ঞতা থেকে জানি ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলে এই ধরনের Net friendship সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এরপর ওপাশ থেকে বিস্তারিত জানার তাগিদ। মোটামুটি জানালাম, জানলামও খানিকটা।

বললাম : I think I'm too old for you.

উত্তর : No problem, friendship-এর জন্য বয়স কোন ফ্যাক্টর নয়।

বললাম : Yet, I'm not your friend.

সে বলল : But I think I can be your friend.

বললাম : I'm married and have a baby girl.

সে বলল : That's fine.

তারপর সরে আসার আর কোনো অজুহাত ছিল না আমার। দুই গুটি উল যেনো বুনে চলেছিল অবিশ্রান্ত কথার মায়াজাল। যতোই জানছিলাম ততোই আশ্চর্য হচ্ছিলাম; কি করে দুজন মানুষের মনের কথাগুলো এমন মিলে যায়!

তখন আমি ভীষণ বিপজ্জনক অবস্থায় ছিলাম পরবাসে, প্রিয়জন থেকে অনেক দূরে। অনলাইন হতে দেরি হলেই ভীষণ উতলা হয়ে পড়তো। কখনো মিস হয়ে গেলে অনেক অফলাইন মেসেজ পেতাম। তার প্রতিটি কথায় ঝরে পড়তো আকুলতা আর আমার জন্য দুশ্চিন্তা। অনলাইনে পেলেই হয়ে উঠতো উচ্ছল। আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো আনন্দের জোয়ারে। ধীরে ধীরে আমি হয়ে উঠেছিলাম তার friend, guide এবং well wisher.

হঠাৎ একদিন মেসেজ উইনডোতে ভেসে উঠলো : I love you.

আমি বললাম, তুমি কি ভেবে বলছো? আমার সব জেনেও?

উত্তর ছিল : হ্যা, সব জেনেশুনেই তোমাকে ভালোবেসেছি। এটা সব নিয়ম কানুনের বাইরে অন্যরকম স্বর্গীয় এক ভালোবাসা।

ততোদিনে আমিও তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। সব দ্বিধা ঝেড়ে প্রত্যুত্তরে সেই কথাই বলেছিলাম।

একদিন তাকে শুনিয়েছিলাম , আমাদের সম্পর্কের শেষ কোথায়?

সে বলেছিল : আমি ভাবতে পারছি না।

তারও একই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, আমার কল্পনার কথাগুলো :

শীতের মনোরম সকাল। শিশির ভেজা লন–এ ইজিচেয়ার পেতে বসে আছি। আশপাশে কয়েক গণ্ডা নাতি নাতনি খেলছে আর আমার কোলে রাখা ল্যাপটপে তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্প করছি। হয়তো তোমার পাশেও ঘুরঘুর করছে তোমার নাতি নাতনিরা।

সে হেসে বলেছিল, সেটা সম্ভব নয়।

দ্বিমত করে বলেছিলাম, সম্ভব হতেও পারে। জীবনে তো আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না। না হোক দেখা, না হোক হাতটা ধরে পাশাপাশি বসে থাকা। শুধু থাক এই যোগাযোগটা।

আমি তাকে ডাকতাম নদী, ভালোবাসার নদী। ওতে বয়ে চলে ভালোবাসা, দুকূল ছাপিয়ে জোয়ারের মতো। ভালোবাসার নদীতে আছে কেবলই জোয়ার। ভাটা তো সে চেনেই না।

মাঝে মধ্যেই সে জিজ্ঞাসা করতো, আমরা বিপরীত না হয়ে একই লিঙ্গের হলে কেমন হতো? তখন নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে এতো বাধা থাকতো না। আমরা একে অন্যকে কাছে পেতে পারতাম, হয়তো আরও বেশি ভালোবাসতে পারতাম।

তার প্রশ্নের উত্তর এখনো আমার জানা নেই...

পরিশিষ্ট

লিটল অ্যানজেলকে আমি আবারও ফিরে পেয়েছি চমৎকার এক গল্পের মতো করে। এখন সে আর ছোট্টটি নেই। এতোদিনে সে পেয়ে গেছে তার Perfect match-কে। যে প্রশ্নটার উত্তর জানার ছিল, সেটা করার প্রয়োজন পড়েনি আমার। তার mail–এ উত্তরটা ছিল এই... I loved you and I shall love you always।

ভাবি, আর কি চাওয়ার আছে আমার? শুধু বেচে থাক এই অনুভূতি আর একটু যোগাযোগ।

নদীর সঙ্গে যোগাযোগটা খানিক কমেছে। অনলাইনে না পেলেও মেইলে যোগাযোগ হয়। এখনো মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করে, আমরা সমলিঙ্গের হলেই ভালো হতো না? এতো বাধার বেড়াজালে আটকে থাকতে হতো না। এখনো তার প্রতিটা মেইল পড়ার পর আমার মনে হয়... এই ভালোবাসার নদীতে শুধুই জোয়ার।

পদ্ম ফোটা গভীর স্বচ্ছ এক টুকরো সরোবর হচ্ছে আমার স্ত্রী, যার কাছে আমি ছাড়া সবকিছুই অর্থহীন। তার ভালোবাসা প্রশান্ত, উদার, বেগবান, কখনো সব এলোমেলো করে দেবার মতো দমকা, কখনো শুধু আলতো স্পর্শে চুপটি করে পাশাপাশি বসে থাকার মতো গভীর।

এই ত্রয়ীকেই আমি ভালোবাসি। কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি?

আমি সত্যি জানি না। কোনো ভালোবাসাই যে অন্যটার সাথে তুলনীয় নয়। আমি শুধু ভালোবেসে যাই। ভালোবাসাতেই যে ভালোবাসা বাড়ে...।

নাম ঠিকানা বিহীন
utopiancloud@gmail.com

একদিন

মিলন

খুলনা ইউনিভার্সিটিতে র‍্যাগিং প্রথা চালু আছে এটা অনেকেরই জানা। ২০০৪ সালে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। নবাগত তাই সাবধানে চুপি চুপি র‍্যাগিংয়ের ভয়ে এক পাশ দিয়ে ক্লাস করতে যেতাম, আসতাম। শিমু, রুমি ও রেখাআপু হঠাৎ একদিন আমার পথ রোধ করে দাড়ালো। শিমু আপুর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। কারণ তিনি আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। রেখা আর রুমিআপু শিমুআপুর বান্ধবী।

শিমুআপুকে ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করলাম। সে হাসিমুখে আমাকে আদর করে ক্যাম্পাসের ভেতর ঝোপঝাড় ও লেকের ধারে নিয়ে গেল। ভাবলাম, শিমুআপু যেহেতু পরিচিত সেহেতু কোনো সমস্যা হবে না। সুতরাং আমারও ভালো লাগছে। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম তাদের চেহারা অগ্নিমূর্তি হয়ে গেল। শিমুআপু রাগতভাবে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, আচ্ছা বেয়াদব তো তুই, তোর সামনে দুইজন আপু আছে, তাদের সালাম দিলি না কেন?

নিরুপায় হয়ে মাথা নিচু করে সালাম দিলাম।

রুমিআপু বললো– ইস সালাম দেয়ার ঘটা দেখ। এই বেয়াদব তুই তো সত্যিই অভদ্র, ভালো করে আবার সালাম দে। তেরোবার সালাম দিলাম কোনোটাই তাদের পছন্দ হলো না।

অবশেষে বললো, তোর নামের পাশে ইতর আর অভদ্র যোগ করবি। তাহলে তোর নাম হবে ইতর মিলন অভদ্র। কি নাম হবে?

আমি বললাম, ইতর মিলন অভদ্র।

এবার বললো, তিনজনের সঙ্গে ৫×৩=১৫ বার নাম বলে পরিচিত হতে হবে। সুতরাং আপু আমার নাম মোহাম্মদ ইতর মিলন অভদ্র বলে পরিচিত হলাম আটাশ বার, কোনো বারই পছন্দ হলো না। এদিকে চড়, কিল ও ঘুষির হুমকি তো দিচ্ছেই। আমার বুকের ভেতর তো ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে, ভয়ে রীতিমতো কাপতে লাগলাম।

রুমি বললো, একদম সত্যি কথা বলবি – কয়টা প্রেম করেছিস?

মানসিক অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ তাই হার্টবিট আরো বেড়ে গেল। প্রথমে মাথা নিচু করে ছিলাম কারণ আগে কখনোই প্রেম তো করিইনি, চিন্তাও করিনি। অথচ এই প্রথম এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম।

কয়েক বার একই প্রশ্ন করলো এবং নিশ্চুপ দেখে জামার কলার চেপে ধরে বললো, এক চড় দেবো কিন্তু।

বললাম, প্রেম করিনি একটাও।

এ উত্তর দিতেই বাম গালে এসে পড়লো এক চড় এবং বললো, এই শালা মিথ্যা বলছে, এই ধর, একে ঠাণ্ডায় পানিতে ফেলতে হবে। ভাবলাম এবার বুঝি পচা পানি খাইয়ে ছাড়বে।

সুতরাং অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ভয়েই মিথ্যা বলতে হলো, হ্যা প্রেম করেছি।

এবার তিনজনে হেসে উঠলো এবং আবার সেই অগ্নিকণ্ঠে দশ বার কান ধরে ওঠাবসা করতে বললো। কারণ প্রথমে অস্বীকার করেছি। যা হোক দশ বার ওঠাবসা করলাম।

রেখাআপু বললো, দুধ ধরেছিস কি?

আমি উত্তর না দিতেই আর একটা চড়। এবার সত্যিই আমার কান্না চলে এলো আর নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো।

শিমুআপু বললো, তুই তো আস্ত ফাজিল। তুই কি কোনো দিন বাজারের গুড়ো দুধ, গরুর দুধ হাতে ধরিসনি?

এবার বললো, এই কোনো দিন কি লাগাইছিস?

বললাম– ছি ছি আপু এসব আমি করিনি।

তারা বললো, তুই তো সত্যি মাগিখোর, আমরা ভালো কথা জিজ্ঞাসা করছি আর তুই খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিস। এই তুই কি কোনো দিন গাছ লাগাসনি, দরজা লাগাসনি? এ শালা তো আস্ত ফাজিল।

আমার মানসিক অবস্থা যে এতো খারাপ ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

এবার প্রশ্ন করলো, ঈএ দেখছি কি না।

আমি লজ্জা, ভয়, কান্না (বুকচাপা) আর মানসিক কষ্টে কোনো কিছুই বলতে পারছিলাম না। তারপরও তাদের জেদাজেদির কারণে বললাম, দেখিনি।

সঙ্গে সঙ্গে আপুরা বললো, তোর কি কিছু নেই না কি, এই এর কাপড় খোল। এদিকে আবার রুমিআপু আমার শার্টটি খুলে ফেলেছে। আমি মানসিক ভয় আর যন্ত্রণায় মুমূর্ষু। সবই খুলে ফেলবে এই ভয়ে বললাম, ঈএ দেখেছি।

তারা বললো, এতে কি হয়?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম লজ্জা আর ভয়ে, কি উত্তর দেবো। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে বললাম, ইয়ে করে। এখন ইয়ে বলেও বিপদে পড়েছি। কারণ ইয়ে মানে বোঝাতে হবে এখন। মাথা নিচু করে চোখ বুজে বললাম, একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে লোক খেলা করে।

এবার বললো, কি খেলে?

জড়িয়ে ধরে ভালোবাসাবাসি করে– এ কথাটা বলতে গিয়ে শত অস্বস্তির মধ্যে যেন একটু শব্দ করে হাসি লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান গালে একটা চড় এসে পড়লো। সেই সঙ্গে বললো, তুই খুব ফাজিল, আমাদের সঙ্গেও ফাজলামো জুড়ে দিয়েছিস। এই বদমায়েশ ইংরেজি অক্ষর ঈ এবং এ কি কোনো দিন দেখিসনি? তুই ফাজিল বলে কি আমাদেরও ফাজিল মনে করিস?

একদিকে রাগে শরীর জ্বলছে অপরদিকে কান্না, লজ্জা, ভয় আর মানসিক যন্ত্রণায় এক করুণ অবস্থার ভেতর পড়েছি। যাহোক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিশ বার কান ধরে ওঠাবসা করতে হলো।

এবার বললো, মনে কর একটা নির্জন ঘরে একটা মেয়ে বস্ত্রহীন হয়ে আছে আর তুই একটা কাজে ওই ঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তোর দিকে দৌড়ে আসছে। এ অবস্থায় তুই কি করবি?

চোখের পানি মুছে বললাম, কিছুই করবো না এবং না দেখার ভান করে চলে আসবো।

এবার আপুরা বললো, সত্যিই তো এবার তোর প্যান্ট খুলে দেখতে হয় তোর কিছু আছে, না কি হিজড়া।

এদিকে রেখাআপু প্যান্টের বেল্ট খুলে ফেলেছে। ভাবলাম এবার আর রক্ষা নেই, কাপড় সবই খুলবে। ভাবলাম আজ সকালে যে কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছে আর মনে মনে আল্লাহকে ডাকলাম।

অবশেষে হাউমাউ করে কান্না চলে এলো এবং তিনজনের পা জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে বললাম, আপু আজ আমাকে মাফ করুন। কালই আমি কাগজপত্র তুলে খুলনা ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে যাবো, দয়া করুন আপু।

তখন তারা আদর করে চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো, আরে পাগল ছেলে, বস্ত্রহীন মেয়েটা তো দুই তিন বছরের বাচ্চা হতে পারে। সে তো তোর খালা, বোন, ফুপুও হতে পারে। সুতরাং তাকে আদর করবি, কোলে নিবি।

এবার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, এতো সময় তোর সঙ্গে মজা করছিলাম। দেখবি এ রকম মজা নিজেও একদিন করবি। এখন বল কি খাবি?

বললাম, দামি হোটেলে খাওয়ালে খাবো। সুতরাং বাধ্য হয়ে খুলনার সবচেয়ে দামি কাফে সালামে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, যা ইচ্ছা খা।

আমি চারশত নব্বই টাকার খাবার খেয়েছিলাম। বিল দিতে গিয়ে তো আপুদের মাথায় হাত। আপুদের সঙ্গে এরপর খুবই ভালো বন্ধুত্ব হয়। তারা পাস করে কর্মক্ষেত্রে চলে গেছে।

কিন্তু শিমুআপু এখন খুব অসুস্থ। বেশ কিছু টেস্ট করিয়েছে কিন্তু রোগ ধরা পড়ছে না। সবার কাছে আমার প্রিয় আপুটির জন্য দোয়া চাইছি, তিনি যেন আরোগ্য লাভ করেন। শিমুআপু, সত্যিই আজ আপনার জন্য আমার কান্না আসছে। অতীতে আপনার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই মনে রাখিনি। আপু লাখো কোটি মানুষের ভালোবাসা আর আমার অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসা ও দোয়ায় নিশ্চয়ই আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসবেন।

খুলনা ইউনিভার্সিটি থেকে

মিস ম্যাডাম

আরিফ

উনিশ কুড়ি বয়সটা এমন এ বয়সে কাউকে ভালো না বেসে থাকাটা খুবই কঠিন ব্যাপার। নিজেকে কেমন যেন ফাকা মনে হয় যদি পাশে কেউ না থাকে। আমার অবস্থাটা ঠিক সে রকমই ছিল। তখন আমি ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারে। আমার অধিকাংশ বন্ধু সে সময়টায় প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কেউ হয়তো ইউনিভার্সিটি লাইফের শুরুতে করা প্রেমের এক বছর সেলিব্রেট করছে তো কেউ পুরনো প্রেমিকাকে নিয়ে মশগুল। আবার কেউ কেউ একই সঙ্গে চার পাচটা চুটিয়ে প্রেম করছে আর কেউ নতুন প্রেমের সন্ধান করছে আমারই মতো। তবে শেষোক্তদের সংখ্যাটা নিতান্তই কম। কি আর করা, এমনই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে যখন সময় কাটাচ্ছি ঠিক সে সময় বিজলির ঝলকের মতো আবির্ভূত হলো এক নতুন ম্যাডাম, আমাদের এক স্যারের প্রকসি হিসেবে তিনি এসেছেন।

সদ্য পাস করা ম্যাডাম খুব সুন্দরী না হলেও তার চেহারার মধ্যে এক ধরনের মাধুর্য ছিল লক্ষণীয় আর তার চাহনি ছিল কাছে টানার মতো। ম্যাডাম আসার পর থেকে যে ক্লাস কখনোই করতাম না তা খুব মনোযোগের সঙ্গে করা শুরু করলাম। ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও ম্যাডামের দিক থেকে চোখ ফেরাতাম না। ম্যাডামও মাঝে মধ্যে আমার দিকে চোরা চোখে তাকাতেন। কি জানি কি ছিল সে চাহনিতে যেন কাছে ডাকতো। আমাদের ম্যাডাম খুব বেশি হলে বছর তিনেকের বড় ছিলেন আমাদের থেকে। ক্লাসের বাইরে আমরা তাকে মিস ম্যাডাম বলে ডাকতাম। এ নামকরণের একটা কারণ ছিল আর তা হলো ম্যাডাম ছিলেন অবিবাহিত। আমাদের সব ম্যাডামই ছিলেন বিবাহিত অর্থাৎ কারো না কারো মিসেস কিন্তু তিনি ছিলেন একমাত্র মিস।

অবশ্য নামটা আমারই দেয়া। যাহোক, গত বছর ভ্যালেনটাইনস ডে-র কথা বলি, খুব সাহস করে একটা লাল গোলাপ নিয়ে এসেছি ম্যাডামকে দেবো বলে। কিন্তু কেন যেন খুব ভয় হচ্ছিল উনি যদি কিছু মনে করেন বা রাগ করে ডিপার্টমেন্ট হেড-এর কাছে কমপ্লেইন করেন। তারপরও মনে সাহস সঞ্চয় করে ক্লাস শেষ হবার অপেক্ষায় বসে রইলাম। ম্যাডামকে অবশ্য সেদিন কেন জানি খুব সুন্দর লাগছিল। ক্লাস শেষ হবার পর বুকে সাহস নিয়ে ম্যাডামের দিকে অগ্রসর হলাম।

মিস ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার আরিফ, কিছু বলবে নাকি?

আমতা আমতা করে খুব তাড়াতাড়ি আমার হাতের লাল গোলাপটা তাকে দিয়ে বলেই ফেললাম, ম্যাডাম আপনাকে আমার খুবই পছন্দ।

দেখলাম ম্যাডাম একথা শুনে রাগ করলেন না বরং জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তার চোখ দুটো ততোক্ষণে পানিতে টলমল করছে। তার কাছ থেকেই পরে শুনলাম তার দুঃখভরা কাহিনী। তার প্রেমিক

আবীরের কাহিনী, যে কি না তাদের বিয়ের দুদিন আগে এক রোড অ্যাকসিডেন্টে প্রাণ হারিয়েছে। সেদিন সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছি তার এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে। আবীরও নাকি ঠিক আমার মতো এ রকম লাল গোলাপ দিয়ে ম্যাডামকে প্রপোজ করেছিল। তার চেহারার সঙ্গে নাকি আমার চেহারার কিছুটা মিল ছিল। তাই ম্যাডাম মাঝে মাঝে আমার দিকে আনমনে তাকাতেন।

এরপর থেকে ম্যাডাম আর আমার মধ্যে এক অন্য ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যার মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখন ম্যাডাম আর আমি খুবই ভালো বন্ধু। আমরা একে অপরের সুখ দুঃখ শেয়ার করি, একে অপরকে পরামর্শ দিই।

আনন্দের বিষয় হলো মিস ম্যাডাম শিগগিরই মিসেস ম্যাডাম হতে চলেছেন। সামনের মাসেই তার বিয়ে হবে তারই এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে
arifaminxxx@yahoo.com

বিসর্জন

বিয়ের পরে স্বামীকে ভালোবাসলাম প্রাণ দিয়ে, প্রাণ ভরে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টে পাল্টে যেভাবে পারা যায় সেভাবেই ভালোবেসেছি। কিন্তু তার মোড়টা ঘুরে গেল কয়েক দিন আগে। এক শুক্রবার রাতে হঠাৎ দেখি স্বামী আমার কমপিউটারে খুব কাজ নিয়ে বসেছে। শুধু তাই নয়, স্টাডি রুমে গিয়ে দেখি কয়েকটি প্রেমের ও বিরহের গানের ক্যাসেটও নিয়ে বসেছে পাশে। একটি প্রেমের গান হচ্ছে আর স্বামী তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুব সুর করে গাইছে।

আমি একটু অবাকই হলাম। সাধারণত সে বাসায় যতোক্ষণ থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকারই চেষ্টা করি সারাক্ষণ। আমার একটু শরীর খারাপ লাগায় ঘরে এসে বিছানায় একটু রেস্ট নিচ্ছি, ঠিক তখনই কানে এলো তার মোবাইলে রিং বাজছে। সে বেশ জোরেই কিছু কথা বলে রেখে দিল।

তার পর পরই আরেকটি ফোন এলো। এবার টের পেলাম সে তার স্টাডি রুমের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর কোনো সাউন্ডও আসছে না সেখান থেকে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার রুমে গিয়ে নক করলাম। মিনিট দুয়েক হবে, দরজা হাট করে খুলে দিল সে। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলে উঠলো, কমপিউটারে কাজ করছিলাম। আমার মনে একটু সন্দেহ হলো, আমি কোনো কৈফিয়ত চাইনি তোমার কাছে। সে থতমত খেয়ে বলে উঠলো সেই একই বুলি, এতোক্ষণ তো কাজই করছিলাম।

এভাবে মিনিট পাচেক চুপচাপ তার পাশে বসে কমপিউটার স্ক্রনের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠলো। কিন্তু মিস কল। সে থতমত খেয়ে ফোন হাতে নিল। আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। আমি ফোনটা চাইলাম তার কাছে। সে ফোন আমার হাতে দিলই না উল্টো আমায় বললো, পাশের রুমে গিয়ে কর্ডলেসটা নিয়ে তোমাদের বাসায় ফোন করো আমার দরকার আছে। আমি চলে এলাম সে ঘর থেকে। ফোন করে ফোনটা দিলাম তাকে। কেমন আছেন জাতীয় কিছু কথা বলে ফোন রেখে দিল। আমি হতভম্ব। সন্দেহ আরো দানা বাধলো। সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে মিস কল দিল সত্যি করে বলো। ফোনটা আমাকে দাও আমি দেখবো।

প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবেন, কিভাবে সে থেকে তুমি পর্যায়ে চলে এসেছি লিখতে লিখতে, কেননা এখানে এসে আমার ভালোবাসার জোর, শ্রদ্ধার জোর ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সে আমাকে ফোনটা না দিয়ে নিজের মুঠোয় রেখে দিল। আমাকে বললো, তুমি যাও। ঘরে গিয়ে ঘুমাও। আমার কাজ আছে। ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু মনটাকে আর কিছুতেই বশে রাখতে পারলাম না। সে কেবলই একটার পর একটা সন্দেহের বীজ আমার মনে বপন করতে লাগলো। তারপর মধ্য রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলো। বিছানা থেকে আস্তে করে উঠে

স্বামীর ফোনটা নিয়ে মিস কল দেখলাম, ডায়াল কল–এ গিয়ে দেখলাম পপি। এখন মনে পড়ছে সে কেন অফিস থেকে রাত দশটার আগে বাসায় আসে না। ভালোবাসা দিবসের ভালোবাসা আমার মন থেকে প্রায় পালিয়েই গেল মুহূর্তের মধ্যে। আমার মনে ভালোবাসার বদলে জন্ম নিল ঘৃণা, অবিশ্বাস। ভীষণ অশ্রদ্ধার স্থানে তাকে বসিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে থাকা ভালোবাসার বাকিটুকু দলিত–মথিত করে একটি নতুন কাদামাটির পিণ্ড বানিয়ে ফেললাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম সেই পিণ্ডে আর কোনো মনের ছাপ ফেলতে দেবো না কোনো দিন। যতোদিন বেচে আছি।

বিয়ের এই কয় বছরে তাকে ভালোবেসেছিলাম মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অস্তিত্ব দিয়ে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। কিন্তু আজ আমার সব কিছু ছিনিয়ে আনলাম তার কাছ থেকে। আমার মনের পাত্র ছিল ভালোবাসা দিয়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যেমন গহীন সমুদ্রের কোনো সংগোপনে লুকিয়ে রাখা পাত্র। সেই পাত্র ভালোবাসা দিবসে আবার সেখান থেকে উদ্ধার করে আনতে চাই। সেই পাত্র থাকবে না আর কখনোই ভর্তি, থাকবে শূন্য একেবারে শূন্য!

যায়যায়দিন–এর ভালোবাসা দিবসে আমার পবিত্রতম ভালোবাসাকে আমি জলাঞ্জলি দিলাম চিরদিনের জন্য। মনে মনে শপথ নিলাম হয়তো দুজনে থাকবো এক সঙ্গে সারা জীবন কিন্তু কখনোই আর তাকে ফিরিয়ে দেবো না আমার সরল ভালোবাসা, আমার অদম্য ভালোবাসা, আমার বাধ ভাঙা ভালোবাসা। আর কখনোই না, কোনো দিনই না।

নাম–ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

লাল টিপ

নূর মোহাম্মদ তালুকদার

একদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি আর গুন গুন করে গান গাচ্ছি। এমন সময় আমার সামনে পরীর মতো একটি মেয়ে এসে হাজির। আমি তো অবাক! তাকে দেখামাত্র বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। আকাশ বাতাস এক হয়ে গেল। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললাম। তা দেখে সে থমকে গেল। আমিও থমকে গেলাম। দুজন দুজনকে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে কতো সময় যে পেরিয়ে গেল কেউ বুঝতে পারলাম না। প্রথম দেখাতেই দুজনের চোখের ভাষায় মনের কথা বলা হয়ে গেলো। কিন্তু কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলার সাহস পেলাম না। প্রথম দিনের এখানেই সমাপ্তি হয়ে গেলো।

মনের ব্যথা মনেই রয়ে গেল। তাকে যে আমি প্রথম দেখাতেই ভালোবাসার খাচায় বন্দী করে ফেলেছি সেটা কি বলতে পারবো না? মনের কথা মনে রেখে কোনো লাভ হবে না। আমাকে বলতেই হবে! কিন্তু তার দেখা পাবো কোথায়?

তারপর ভালোবাসার একটি চিঠি লিখলাম। চিঠিটি সব সময় পকেটে নিয়ে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও তার দেখা পেলাম না। মনটা বিমর্ষ হয়ে গেলো। পড়ন্ত বিকেলে ফাহিমকে নিয়ে দাড়িয়ে আছি কলেজের সামনে। হঠাৎ তার আবির্ভাবে মনে মনে ভাবলাম, মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

তাকে দেখামাত্র মনের সমুদ্রে খুশির জোয়ার বয়ে গেল। ফাহিমকে বললাম, সে–ই হলো আমার কাঙ্ক্ষিত রমণী।

ফাহিম বললো, বন্ধু তোর তারিফ করতে হয়।

এরপর তার সঙ্গে কথা বললাম। কথা বলার ফাকে চিঠিটা পুশ করলাম। তাকে কলেজের সামনে আসতে অনুরোধ করলাম। সে আমার চিঠি হাতে নিয়ে অতি সহজে রাজি হয়ে বললো, কাল অবশ্যই আসবো।

আমি বললাম, কাল কিন্তু চিঠির উত্তর নিয়ে আসতে হবে।

সে চলে গেলো।

ফাহিম বললো, গাধা।
আমি চারপাশ দেখলাম – না, কেউ নেই।
ফাহিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে বললি?
কেন, তোকে?
আমি আবার কি দোষ করলাম?
তোমার প্রিয়ার নামটা তো জানলে না। তার বাড়ি কোথায় এবং সে কি করে সেটাও জানলে না।
বন্ধু, প্রেম অন্ধ। অতো জেনে শুনে হয় না।
তোর সঙ্গে কথায় আমি পারবো না। চল বাসায় যাই।

পরদিন সময় যেন কাটে না। কিন্তু কেন? কি তার মন চুরি করেছি। না সে আমার মন চুরি করেছে। আগে জানতাম না অপেক্ষার প্রহর এতো কঠিন। তার আশায় আমি নির্দিষ্ট জায়গায় তিন ঘণ্টা আগেই গিয়ে পৌছি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি অবাক– আমার আগেই সে এসেছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এতো সকালে!

সে আমাকে উল্টো প্রশ্ন করলো, তুমি এতো সকালে?
আমি এসেছি ভালোবাসার টানে।
আমিও তাই।
তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, তুমি কিছু মনে করবে না তো?
তোমার নাম কি?
এই কথা! আমার নাম রিনি।

তারপর রিনি আমাকে ভালোবাসার চিঠিটি দিয়ে বললো, এখানে খুলবে না। বাসায় গিয়ে পড়বে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজ আমাদের ভালোবাসার প্রথম দিন। মজার ব্যাপার হলো, সেদিন ছিল ভ্যালেনটাইনস ডে।

রিনি আমার হাত ধরলো। সে হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীর কাপতে লাগলো। আকাশ ও মাটি যেন এক হয়ে গেলো। কোথায় আছি, বুঝতে পারলাম না। তারপর দুজনে রিকশায় ঘুরে বেড়ালাম। এভাবে আমরা ভ্যালেনটাইনস ডে উদযাপন করলাম। আর ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে তার কপালে চুমুর লাল টিপ পরিয়ে দিলাম।

মিয়াপাড়া, হারাগাছ, রংপুর থেকে

যিশুর মায়ের গল্প

আমি স্বল্প শিক্ষিত এক মহিলা। পিতৃকুলের দিক থেকে গ্রামীণ পর্যায়ে মধ্যম সারির অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ এবং কট্টর রক্ষণশীল পরিবারে বেড়ে উঠি। বাংলা লেখাপড়ার নামগন্ধও পাইনি তখন। বাড়ির মসজিদ, মক্তবে হুজুরের কাছে কিছু সুরা কেরাত মুখস্থ করা ও পবিত্র কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করা পর্যন্তই ছিল আমার শিক্ষা।

পচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের এক পর্যায়ে ২০০০ সালে দশ মাস মেয়াদি উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হলে মহিলা দলে ভর্তি হয়ে যা শিখেছি তাতে চিঠিপত্র লিখতে না পারলেও চিকন ফ্রেমের পাওয়ারফুল গ্লাসযুক্ত ডাট বিহীন চশমাকে কালো কাইতনের সুতা বেধে চোখে দিয়ে সহজ ভাষায় লিখিত বই–কিতাব পড়তে পারি। তাই নিজেকে স্বল্প শিক্ষিত বলছি।

পারিবারিক পরিবেশের কারণেই ছোটবেলা থেকে নামাজ পড়ি। স্বামীও নামাজি। কৃষি নির্ভর পরিবারে থেকেও পর্দা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করি। গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই অশিক্ষিত। অত্যাবশ্যকীয় ন্যূনতম

ধর্মীয় জ্ঞানটুকু পর্যন্ত অনেকেরই নেই। গ্রামে একটি কথা প্রচলিত আছে নাই দেশের খাটাশই বাঘ। এলাকায় মৃত নারীদের গোসল ও কাফনের কাপড় পরানোসহ বিভিন্ন দিকে আমার আচরণ ও চলাফেরাতে স্বতন্ত্র ধারার লক্ষণীয় কিছু বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকায় সমাজের অনেক মহিলাই আমার কাছে আসে টুকটাক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে। আমিও এতোদিন এই ভেবে কিছুটা গর্ববোধ করতাম যে, যথেষ্টই তো জানি।

ইদানীং হঠাৎ আমার চিন্তা চেতনাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আমি আসলে কিছুই জানি না। আলোর জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অন্ধকারময় নিভৃত এক দ্বীপতুল্য ক্ষুদ্র কুটিরের বাসিন্দা। খোদার সৃষ্ট দুনিয়াটা যে প্রকৃতপক্ষে খুবই বিশাল এবং অসাধারণ সুন্দর। তবে একে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে সুশিক্ষার কোনোই বিকল্প নেই!

এসব ভাবনার মূল নায়ক শ্বশুরকুলের দিক থেকে আমার চাচাতো দেবর আবির। যে কি না কখনো তুহিন কখনো শিশির। আবার কোথাও বা মোল্লা নামে পরিচিত যা নিকট অতীতেও আমার অজানা ছিল। ত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে শ্বশুরবাড়ি এসে আবিরের সঙ্গে আমার ত্রিশ দিন কথা হয়েছে কি না সন্দেহ আছে। যদিও গর্ভজাত তিনটি সন্তান নাজমুল, নিয়ামুল ও সুরমাকে মূলত সে বা তার মা-ই সার্বক্ষণিক দেখাশোনা বা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ মোতাবেক ১৪ শাবান সোমবার পবিত্র শবে বরাতের দিন থেকে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি। রোগে ভুগে অসুস্থ অবস্থায় ওই দিন নিরুপায় হয়ে বিশ্বস্ত ও পূত চরিত্রের অধিকারী ভেবে তাকে ডেকে এনে বিশেষ অনুরোধ করে সঙ্গে নিয়ে ভৈরব আল শেফা হাসপাতালে যাই। যাওয়ার পথেই জ্ঞান হারাই। এরপর থেকে ভৈরব-ঢাকা বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে আমার সেবা শুশ্রূষাসহ যাবতীয় কাজে তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। সেও উদার পবিত্র মনে অমানুষিক শ্রম দিয়ে অকৃপণভাবে তার ভাবীর প্রতি পবিত্র দায়িত্ব মনে করে আমাকে সেবা দিয়েছে। এরই ফাকে তার মুখ থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানান কথা শুনতাম মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে।

লেখালেখি কি তা আদৌ জানতাম না বা এখনো বুঝি না ততোটা। এ কয়দিনে দেবরের মুখে শুনেই যৎসামান্য ধারণা হলো। বিশেষ করে সাপ্তাহিক যায়যায়দিন-এর বিশেষ সংখ্যাগুলোর ভিন্ন স্বাদের গল্প শোনাতো সে, যা খুব ভালো লাগতো।

তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভালোবাসা সংখ্যার মাধ্যমে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু স্মৃতি দুঃস্মৃতির কথা পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরার মতো দুঃসাহস জাগে। কিন্তু নিজে নামটি ছাড়া কিছুই লিখতে পারি না। এক্ষেত্রেও তার দ্বারস্থ হলাম। অর্থাৎ লেখাটা সম্পূর্ণ তার নিজের হাতের।

এক. ২০০২ সাল। কোনো এক রাতে এশার নামাজ শেষে আমার স্বামী ঘরে এসে বলে গেল পাশের বাড়িতে মিলাদ শরীফে যোগ দিতে যাচ্ছে। তিন রুম বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘরের এক রুমে আমি অন্ধকারে শুয়ে আছি। স্বামী বাহির থেকে শিকল টেনে দরজা বন্ধ করে যাই।

সামান্য বাদেই টের পাচ্ছি কে যেন আমার পায়ে ধরে টানছে। ভাবছি এতো তাড়াতাড়িই স্বামী এসে গেল? কিন্তু পরক্ষণেই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে আমার স্বামীই সর্ব কনিষ্ঠ। বোনেরাও বিবাহিত। আমার মেজ ভাশুরের প্রথম স্ত্রী পাচ সন্তান রেখে দুরারোগ্য রোগে ১৯৮৬ সালে মারা যায়। ভাশুর তখন সউদি প্রবাসী। আমি দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মাতৃত্বের স্বাদ পূরণ করতে না পেরে ভাশুর দেশে থাকতেই কেদে কেটে ৮৫ সালের প্রথমে তার এক শিশু কন্যাকে দত্তক এনে লালন-পালন শেষে বিয়ে দিয়ে বর্তমানে নানু ডাকও শুনছি।

মা পরপারে। বাবা প্রবাসে। আট মাস বয়সী শিশুসহ এতোগুলো এতিম সন্তানের গুরুভার কে নেবে? আমরা তখনো যৌথ পরিবারেই ছিলাম। শিশু আবদুল্লাহ এবং সবার বড় ছেলে আতর সহ সবাইকে পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহে পরম আদরে লালন-পালন, আদর-যত্ন করে তাদের মাতৃত্বের অভাব পূরণ করে

গেলাম অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আন্তরিক মায়া-মমতায়। রহিমের বয়স তখন বারো বা তেরো হবে। আমাকে খালাম্মা সম্বোধন করলেও এক সময় মায়ের মতোই দেখতো।

সেই রহিম আজ ঘরে বৌ রেখে চুপি চুপি আমার ঘরের দরজা খুলে পায়ে ধরে টানছে। সেও ইতিমধ্যে দুইটি বিয়ে করে ফেলেছে।

উল্লেখ্য, পয়তাল্লিশ ঊর্ধ বয়সী বর্তমানে তিন সন্তানের জননী হলেও স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে আমার বয়স ধরাটা একটু মুশকিল। স্বাস্থ্য ভালো। একেবারে সুন্দরী না হলেও শারীরিক গঠনের কারণে আকর্ষণীয় বলা চলে।

আমাকে জাগিয়ে সে তার বিকৃত কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করার কুবাসনা ব্যক্ত করলো ফিশফিশিয়ে। যথেষ্ট বলশীলা হয়েও মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম। কারণ আমি যে নারী! অবলা! অন্ধকারে ভয়ে কাপছি আর দুরু দুরু বুকে কম্পিত কণ্ঠে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, প্রথমত. আমি তার কাকিমা। দ্বিতীয়ত. তার মাতৃত্বের অভাবও কিছুটা আমিই পূরণ করেছি। কিন্তু সে আমার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না। শেষে মনোবল কিছুটা চাঙ্গা করে একটু উচু স্বরেই বললাম, তোর তো কম বয়সী সুন্দরী আরেক মা ঘরে আছে। তার কাছে গিয়ে বাপ-বেটায় এক সঙ্গে থাকলেই পারিস।

এমন তর্কের এক পর্যায়ে বাইরে স্বামীর কাশির শব্দ শোনা গেলে আমার এক সময়ের পালিত পুত্রধন আতর অপর দরজা দিয়ে চোরের মতো দ্রুতবেগে বের হয়ে যায়। আল্লাহর অসীম রহমতে সেদিন নারী জীবনের অমূল্য সম্পদ আমার সতীত্বটা অল্পের জন্য রক্ষা হয়। ঘটনাটি স্বামীর কাছে গোপন রেখেছিলাম পরে কোনো ঝামেলা হওয়ার ভয়ে।

দুই. আমার স্বামী বর্তমানে সউদি প্রবাসী। দত্তক কন্যাকে বিয়ে দিয়েছি সে আগেই উল্লেখ করেছি। গর্ভজাত তিন সন্তানের প্রথমটা মাদরাসাতে, দ্বিতীয়টি এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। সর্বশেষ একমাত্র মেয়ে প্রাইমারিতে অ আ ক খ শিখছে। কৃষক পিতার সন্তান এবং কৃষক পরিবারে বৌ হয়ে এলেও স্বল্প শিক্ষিত সহজ সরল স্বামীর নমনীয়তার কল্যাণেই যৌথ পরিবারে থাকাকালীন সময়ের মতোই এখনো ঘর গৃহস্থালির কাজ তেমন করি না। অন্য লোক মারফতই কাজ চালিয়ে নিজে প্রায় সব সময় এক নির্জন ঘরে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়ে ধর্ম সাধনাতে লিপ্ত থাকতাম অসুখ হওয়ার আগ পর্যন্ত।

মেজ ভাশুর আমাদের জমির বর্গা চাষী। তাছাড়া বাজার সদাই করাসহ বিভিন্ন কাজে মেজ ভাশুরই ছিল অভিভাবকের ভূমিকায়। আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে লক্ষ্য করে এসেছি বছর অধিক কাল ধরে মেজ ভাশুর আমার প্রতি কেমন যেন ভিন্ন দৃষ্টি দিতে শুরু করেছে। নদীতে না গিয়ে বাড়ির উঠোনেই খোলা জায়গায় চাপকলে গোসল করি। আমাদের গোসলখানা নেই। খেয়াল করি প্রতিদিন গোসল করে কাপড় পাল্টানোর মুহূর্তে মেজ ভাশুর আমার কাছে এসে অযথা আলাপ জুড়ে দেয়। চটের বস্তা দিয়ে ঘেরা ভাঙা টয়লেটে ঢুকলে সে অদূরে পায়চারি করে। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। গোসলখানা, টয়লেট না করাতে স্বামীর প্রতি রাগও হয় এমন পরিস্থিতিতে।

কখনো বা ঘরে ঢুকে এমন লজ্জাজনক কথাবার্তা বা গল্প গুজব করে যা তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে বলা মোটেও সমীচীন নয়। বুঝতে পারি সে মুহূর্তে তার কথায় তাল মিলিয়ে আমিও যদি কথা বলি বা হাসি দিই তবে সে ভীষণ রকম উৎসাহিত হয়ে যে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। তাই মৌনব্রত পালন করতাম। এমন পরিস্থিতিতে ঘরের সবাইকে সতর্ক করে বলেও রেখেছি সে ঘরে ঢুকলে তারা যেন কাছে থাকে। কিন্তু এতোসব মনস্তাত্ত্বিক দিক প্রয়োগ বা অতি সাবধানতা অবলম্বন করেও আমার শেষ রক্ষা হলো না।

স্বামী প্রবাসে। ছেলেমেয়েরা অবুঝ। বড় ভাশুর বৃদ্ধ এবং একেবারেই অজ্ঞ। নিরেট মূর্খ। মেজ ভাশুর ও তার বড় ছেলেকে বিশ্বাস করতে না পেরে অসুখে পড়ে এই দেবর আবির এবং আমার ছোট বোনের সাহায্য নিলাম।

রমজান মাসে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথেই জ্ঞান হারাই। রাত পেরিয়ে ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরে পাই। সকালে রুমে দুর্বল শরীরে একাকী শয্যাশায়ী হয়ে আছি। অন্যরা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। এমন সময় মেজ ভাশুর ঘরে ঢুকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে ভালো মানুষটির মতো প্রশ্ন করলো, হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এনে বিছানাতে শোয়ানোর পর তোমার কি হুশ ছিল? বললাম, না। তখনি মনে সন্দেহ জাগলো তবে কি গত সন্ধ্যায় কোনো ফাকে সে ঘরে ঢুকে আমার শরীরে হাত দিয়েছিল? এসব ভাবতেই সে অজান্তে হঠাৎ আমার পেটের ওপর ডান হাতটি রেখে প্রশ্ন করলো, তোমার পেট ফোলা লাগছে কেন? কোনো সমস্যা আছে কি? রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ডান হাতে ধাক্কা দিয়ে তার হাতটি সরিয়ে দিয়ে ত্বড়িত গতিতে বললাম, কোনো সমস্যা নেই। এতে সে কিছুক্ষণের জন্য থতমত খেয়ে গুটিসুটি হয়ে চৌকির কোণে নীরবে বসে থাকে। আমিও মুখটা একটু পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে রাখি। তার দিকে তাকাতেও আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু এই শয়তানের বাচ্চা তার শরীরটা হেলিয়ে ধবধবে শাদা দাড়িযুক্ত ছাগলের ন্যায় মুখখানা নামিয়ে আমার ডান গালে ঠুস করে চুমু দিয়ে নীরবে প্রস্থান করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। সে সময়ে আমার বুকে চাপা কষ্ট নামক ধূমায়িত ক্ষোভ আর ঝড়ের যে ভয়াল তাণ্ডব বয়ে যাচ্ছিল তা ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য। কষ্টটা আজ পর্যন্ত শুধুই অনুভব করতে পারি।

পরক্ষণে মেজ ছেলে ঘরে এলে তার গলা জড়িয়ে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বুকের ভেতর ঘুরপাক খাওয়া অসহনীয় চাপা কষ্ট সামান্য পরিমাণ লাঘবের ব্যর্থ বাসনাতে মা হয়ে অবুঝ সন্তানটির কাছেই ঘটনা বিস্তারিত বলে ঘরে না থাকার দরুন রাগে তাকে কিছু গালমন্দও করলাম। তারপর অসুস্থ শরীরেই উঠে গিয়ে বড় ভাশুরকে অতীত-বর্তমান সব বিষয় বুঝিয়ে বলে এতোটুকু অনুরোধ করলাম তার লুচ্চা ছোট ভাইটিকে যেন বলে দেন আমার ঘরে না আসতে।

তৃতীয় আরেকটি ঘটনা না বললে লেখাটা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাঠকরাও বিভ্রান্ত হতে পারেন। প্রথম স্ত্রী মারা গেলে মেজ ভাশুর দেশে এসে তার পাগল শ্যালকের তালাকপ্রাপ্তা স্বল্প বয়সী সুন্দরী স্ত্রীকে বিয়ে করে আবার বিদেশে চলে যায়। যাওয়ার আগে তার পুত্রকে আমার কোল থেকে এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাকে প্রায় আড়াই বছর লালন করেছিলাম। এ কষ্টটা ভোলার নয়। সে সময় তার যুবা বয়সী দ্বিতীয় ছেলে একই ঘরে সৎ মায়ের সঙ্গে থাকতো। এক পর্যায়ে মা-পুত্রের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা নিয়ে সমাজে কানাঘুষা চলতো। বড় ছেলেও তখন বিদেশে। আমি এক রাতে তাদের অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় দেখে বড় জা-এর মাধ্যমে বড় ভাশুরকে ডেকে এনে অপকর্মটি চাক্ষুস দেখিয়েছিলাম। অন্য আরো কিছু লোকের সঙ্গেও নতুন এই মেজ জা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। ধরা পড়েছে বার বার। ভাশুর দেশে এলে এসব নিয়ে অনেক কথাও হয়।

এখন আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগছে, ওই অপকর্মটি ধরিয়ে ভাশুরের মানহানির অপরাধেই ঘরে তার স্বল্প বয়সী যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সেও এতোদিনে আমাকে কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে?

বিবেককে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর খুজে পাই না। এতোটা সাবধানতার পরও কেন আমাকে নরকীটের চুমু নামের সর্পিল দংশনটা সইতে হলো, যা আমাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে? আর যন্ত্রণার মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কি আমার নিয়তি? নাকি ইসলামের বিধান মোতাবেক পরিপূর্ণরূপে পর্দা প্রথা মেনে না চলার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম? ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় আমি হয়তো আর সতী নেই। আমার অমূল্য সম্পদ যেন হারিয়ে ফেলেছি। শুধুই হাহাকার।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
নরসিংদী থেকে

গিফট

রূপা সিংহ

যখন এইচএসসি পরীক্ষা দেবো সে সময়ের ভালোবাসা দিবসের একটা ঘটনা আজো আমার স্মৃতিতে ভাসে। সালটা ছিল ২০০০। আমি মিলেনিয়াম নামে একটি কোচিং সেন্টারে পড়তে যেতাম, সেখান থেকে ফেরার পথেই ঘটেছিল ঘটনাটা।

১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। সেদিন ব্যাচের সবাই সকালে ক্লাস করতে গিয়েছি কোচিং সেন্টারে। কিন্তু সেদিন আর কোনো পড়াশোনাই হয়নি। স্যাররা বললেন, আজ লেখাপড়া নয়, আজ হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যে যা পারো সেটাই আজ তাকে উপস্থাপন করতে হবে। মোটামুটি যে যা পারে অর্থাৎ কেউ গান, কেউ কবিতা আবৃত্তি, কেউ কৌতুক, কেউ অভিনয় করে দেখালো। তারপর আমাদের স্যাররা নাশতা খাওয়ালেন। যাহোক, সব শেষ করে আমরা বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

আমার বাড়ির পথটা ছিল একটু ভিন্ন দিকে, যার জন্য আমাকে একাই যাতায়াত করতে হতো। তাই সেদিনও একাই রওনা হলাম। কিন্তু রিকশা না পেয়ে হেটে রওনা হলাম। খানিক পথ আসতেই একটা ছেলের কণ্ঠ আমাকে থামিয়ে দিল। পেছন থেকে একটা ছেলে আমাকে ক্রমাগত ডাকছে। পেছনে তাকাতেই তাকে চিনলাম। ছেলেটি আমাদেরই কোচিং ক্লাসের এইচএসসি ব্যাচের ছেলে আর তার হাতে একটা গিফট প্যাকেট। আমার কাছে এসে বলল, রূপাআপু এটা আপনার। কথা শুনে খুবই অবাক হলাম এবং বললাম আমার মানে?

এক ভাইয়া আপনাকে এটা দিয়েছেন।

আশপাশে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। তারপর কে জানতে চাইতেই সে আমাকে জানালো তার নাম সাগর এবং পাবলিক কলেজে পড়ে। এছাড়া আর কিছু সে জানে না। কিন্তু এই নামে আমি কাউকেই চিনি না ও দেখিনি এবং আমি তাকে বললাম, তুমি ভুল করছো। আমাকে নয় অন্য কাউকে দিয়েছে।

আপনি যখন রুম থেকে বের হয়েছিলেন তখন তিনি আমাকে দূর থেকে আপনার জামার রঙ এবং নাম বলে পাঠিয়েছেন। তাই আমার মোটেও ভুল হচ্ছে না।

এসব কথা শুনে আমার খুব রাগ হতে লাগলো। তাকে খুব বকা দিলাম আর অপরিচিত মানুষের দেয়া গিফট তো আমার নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, আমাকে নিতেই হবে। তখন সে আমাকে বললো, তাহলে একটু ছুয়ে দিন।

কিন্তু সেটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলে হাটতে শুরু করলাম এবং ভাগ্যক্রমে একটা রিকশাও পেয়ে গেলাম। তাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি এলাম। সারা দিন সারা রাত ভেবে কিছুই পেলাম না।

পরদিন আবার কোচিং ক্লাস করতে গেলাম। কিন্তু মজার ব্যাপার সেদিন কিছুই হলো না এমনকি ভালোবাসা দিবসের আগেও কোনো ঘটনা ঘটেনি। আবার ভালোবাসা দিবসের পরদিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনো কিছুই ঘটেনি শুধু ওই দিনটাই এমন ঘটলো।

আজো আমি জানি না, সে কে ছিল এবং কেনই বা আমাকে ভালোবাসা দিবসে গিফট দিতে চেয়েছিল। হয়তো আমি যদি ওই দিন গিফট প্যাকেট গ্রহণ করতাম তবে সে মনে হয় আমার সামনে আসতো। আমি গিফটটা গ্রহণ করিনি বলেই হয়তো আজো আমি তাকে চিনতে পারিনি। এরপর থেকে প্রত্যেক ভালোবাসা দিবসেই আমার এ ঘটনাটা মনে পড়ে। কখনো বেশ ভালো লাগে, আবার কখনো খারাপও লাগে। কারণ যাকে নিয়ে ঘটনা সেই রয়ে গেছে ঘটনার আড়ালে।

পূজাখোলা, বয়রা, খুলনা থেকে

বিচ্যুত

২০০২ সালের এক এপৃল। বাইশ বছরের পুরনো আবাস ছেড়ে মাকে নিয়ে জীবনের প্রথম কোনো বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে ঢুকি। একটি ছোট বারান্দাসহ রুম ও একটি বড় রুমে মোটামুটি সংসার গোছালাম, মাকে বড় রুমটায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে ছোট রুমটায় আশ্রয় নিলাম।

আম্মা নিম্ন বেতনের একজন সরকারি চাকুরে। আমি কলেজের গণ্ডি পার হয়ে অত্যাবশ্যকীয় বেকারত্ব গ্রহণ করি। আম্মা সকাল ৮টায় অফিসের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হওয়ার পর বিছানা ছেড়ে উঠতাম। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ করে আগে যে মহল্লায় থাকতাম সেখানে যেতাম। রাত নয়টা দশটার আগে কখনোই বাসায় ফিরতাম না। মাঝে মধ্যে বারোটা বেজে যেতো। আবার সারা দিন বাসায় থেকে যে দিন বিকেলে যেতাম, সে দিন আর বাসায় ফিরতাম না, বন্ধুদের সঙ্গে রাত কাটাতাম। এই ছন্নছাড়া অবস্থার জন্য মা প্রায়ই বকাঝকা করতেন। কিন্তু তেমন একটা গায়ে মাখতাম না।

এ বাড়িতে আমরা ছাড়া আরো তিন ঘর ভাড়াটিয়া আছে। আমাদের পাশের ঘরে বাড়িওয়ালার বড় মেয়ে থাকে। পাচ/ছয় বছরের তার একটা ছেলে আছে। যেদিন বাসায় থাকতাম ছেলেটা প্রায়ই দরজায় দাড়িয়ে উকি দিতো। মাঝে মধ্যে ডাকলে লাজুক হাসি দিয়ে চলে যেতো। একদিন ডাক দেয়ার পর ভেতরে আসে। টিভিতে মুভি দেখছিলাম আর ইটের ভাটার ধোয়া ছাড়ছিলাম। কাছে এসে বসার পর নাম জানতে চাইলাম। সে নাম বললো। বললাম, কোন ক্লাসে পড়? বললো, কেজি ওয়ান। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বেশ ভাব জমিয়ে নিলাম। হঠাৎ ছেলেটা বললো, আপনি সিগারেট খান কেন? কোনো উত্তর না করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর ছেলেটার মা নাম ধরে ডাক দিলে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর ছেলেটি আবার এলো এবং আগের মতো আমার পাশে বসলো। তারপর খুবই শান্ত গলায় বললো, আংকল, তুমি প্রত্যেক দিন কোথায় যাও?

আগে যেখানে থাকতাম সেখানে।

আমাকে নেবে?

অবশ্যই নেবো, তুমি যাবে? হ্যা বলে আমার হাত ধরলো। এর মধ্যে তার আম্মু এলে এবং হাসিমাখা মুখ নিয়ে বললেন, আপনি আজকে যাবেন না? হাসি দিয়ে বললাম, না। তারপর বললেন, আমার তো কোনো আত্মীয়-স্বজন এখানে থাকে না তাই আমার ছেলেটাও একাই থাকে। সে যদি আপনাকে জ্বালাতন করে কিছু মনে করবেন না। ভদ্রতার খাতিরে বললাম, সমস্যা নেই। তাকে পাঠিয়ে দেবেন। আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন।

এরপর থেকে মাঝে মধ্যে তার ছেলের সঙ্গে তিনিও আসতেন এবং কথা বলতেন, গল্প করতেন। আমি প্রায় রাত জেগে উপন্যাস, যাযাদির বিশেষ সংখ্যাগুলো পড়তাম, লেখালেখি করতাম। একদিন মা বললেন, তুই অনেক রাত পর্যন্ত বাল্ব জ্বালিয়ে রাখবি না। এটা তারা পছন্দ করে না। তাছাড়া বেশি রাতে বাসায় ফিরি বলে মায়ের কাছে নালিশ করেছে।

হঠাৎ একদিন রাত নয়টায় বাসায় ফিরে আমাদের ঘরে ১৬/১৭ বছরের একটি মেয়ে দেখে মনে কৌতূহল জাগে। মা বললেন, বাড়িওয়ালার ছোট মেয়ে। মেয়েটাকে প্রথম দেখাতেই আমার ভালো লাগলো। তাছাড়া অল্পক্ষণের মধ্যেই তার আচরণে কিছু একটা ইঙ্গিত পেলাম, অচিরেই আমার ভালো লাগা ভালোবাসায় রূপ নিল।

একদিন বাসায় ফিরে দেখি সে নেই। মনের মধ্যে হাহাকার অনুভব করলাম। আগের সব কিছু ভুলে বাড়িওয়ালার বড় মেয়ে লিপিআপুর সঙ্গে খাতির জমাতে লাগলাম। তার ছেলে এবং স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্ক গভীর করলাম। কিন্তু তাদের বুঝতে দেইনি। এর মধ্যে আমার একটা চাকরি হয়।

একদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি সুমি আবার বেড়াতে এসেছে। পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙলো সুমির চিমটির আঘাতে। আমি চোখ খুলে রাগতভাবে তাকাতেই বললো, ফুপু বললেন, তাই জাগাতে এসেছি। বেশি ব্যথা পেলে ক্ষমা করবেন।

ক্ষমার তো প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিদিন সকালে এমন কোমল হাতের স্পর্শে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হোক খোদার কাছে এ দোয়াই করি। আমার কথা শুনে কিছু না বলে মুখ ভেংচি কেটে চলে গেল। আমিও তৈরি হয়ে অফিসে যাই। রাতে সেদিনের ঘটনাগুলো ডায়রিতে লিখি।

পরদিন সকালে আবার একই কাণ্ড করলো। আমি সজাগ হতেই বললো, আজ কিন্তু ফুপু বলেনি।

বৌকে কি শাশুড়ি প্রতিদিন দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়? আবার ভেংচি দিয়ে চলে গেল। আমি বাসা থেকে বের হবো তখন এসে বললো, আচ্ছা গত রাতে আপনি এতো রাত পর্যন্ত বাল্ব জ্বালিয়ে কি করেছেন?

ডায়রি লিখেছি।

আমি আপনার ডায়রি পড়তে পারি?

কারো গোপন কিছু কি পড়া উচিত?

গোপনই যখন তাহলে লিখেন কেন?

মুখে প্রকাশ করতে পারি না তাই কলম দিয়ে প্রকাশ করি।

কিছু জিনিস সাহস করে মুখেই বলতে হয়, না হলে প্রকাশ পায় না।

এতোই যখন বুঝেন তাহলে বুঝে নেন না কেন? তারপর রুম থেকে বের হয়ে গেলাম।

পরদিন শুক্রবার আগের মহল্লায় যাচ্ছিলাম। সুমি এসে বললো, কোথায় যাচ্ছেন?

ঘুরতে।

তাড়াতাড়ি আসবেন। অপেক্ষায় থাকবো। কিন্তু সে রাতে বাসায় ফেরা হয়নি। পরদিন সকালে এসে শুনলাম সুমি রাত একটা পর্যন্ত সজাগ ছিল। পাশের বাসার একজন এ কথা লিপি আপাকে বলার পর সঙ্গে সঙ্গে সুমিকে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারা স্বামী-স্ত্রী আমাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করলেন। তাছাড়া অনেক বাজে কথাও বলেছেন। এমনও বলেছেন, প্রয়োজনে বোনকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবো তবু সেই ছেলের কাছে বিয়ে দেবো না। বরাবরই আমি চুপ থেকেছি, প্রতিউত্তর করিনি। তারা আমার সঙ্গে কথা বলে না। ছেলেটাকেও আসতে দেয় না। আমিও কথা বলি না।

কয়েক মাস পর লিপিআপা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মা প্রায়ই গিয়ে তার সঙ্গে হাসপাতালে থাকেন। একদিন মা এসে বললেন, তোকে একবার যেতে বলেছে। তোর বড় বোনের মতো, যা হয়েছে শেষ হয়ে গেছে। একবার দেখে আয়। কিন্তু আমি যাইনি। তাদের বাসা ছেড়ে যাওয়ার তাগিদও অনুভব করিনি। ভালো হয়ে হাসপাতাল থেকে আসার পর তিনি কথা বলতে চাইতেন। কিন্তু আমি এড়িয়ে চলতাম।

একদিন মা দুজনকে মিলিয়ে দিলেন। এরপর থেকে দুইজনে আবার কথা বলতাম। সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে তাদের পারিবারিক ব্যাপারেও কথা বলতেন। আমিও আমার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তাকে বলতাম। তিনি প্রতিদিন সকালে আমি অফিসে যাওয়ার আগে রুমে আসতেন।

একদিন এক বন্ধুর নাম্বারে ফোন করলাম। বার বার এনগেজড রিং বাজছিল। তাই লিপিআপাদের ফোনে পরীক্ষামূলক কল করলাম। উল্লেখ্য, তাদের ফোনে কোনোদিন কল করিনি। এমনিই নাম্বারটা লেখা ছিল। পাচটা রিং বাজার পর ফোন ধরলেন। তারপর পরিচয় দিলাম, বেশ কিছুক্ষণ কথাও হলো দুইজনের মধ্যে। শেষে তিনি বললেন, মাঝে মধ্যে ফোন করলে খুশি হবো। এরপর থেকে প্রতিদিন সকালে এবং ফোনে দুইজনের বেশ আলাপ হতো। অনেকটা বন্ধুত্বের মতো ফ্ ভাবে।

একদিন সকালে তিনি রুমে আসার পর কথা বলছেন এবং শুনছেন। কিন্তু আমার মনে হলো তিনি কেমন যেন অস্থির। মাঝে মধ্যে দাত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন এবং বার বার আমার চোখে চোখ ফেলছেন। রুম থেকে বের হবো তাই বললাম, আপনি দরজাটা বন্ধ করেন, আমি চলে যাচ্ছি। দরজা বরাবর আসার পর

পেছন থেকে একটা শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। *Kiss* শব্দটা কানে ঢোকার সঙ্গে জাগতিক সব পরিস্থিতি ভুলে গেলাম এবং পেছনে ঘুরে তাকে ঝাপটে ধরে আমার দুই ঠোটের মধ্যে তার ঠোট ঢুকিয়ে দিলাম। আবেগ প্রশমিত হওয়ার পর তাকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে রুম থেকে বের হয়ে গেলাম। যেতে ভাবলাম, আমি কি করলাম! কাজটা কি ঠিক হলো? ইতিবাচক নেতিবাচক ভাবনার পর দুপুরের দিকে ফোন করে প্রথমেই ক্ষমা চাইলাম।

তোমার কি দোষ, আমিই তো বলেছি। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এটা নিয়ে অহেতুক চিন্তা করলে শরীর খারাপ হবে। আসলে কিসে যে কি হয়ে গেল বুঝলাম না।

শোন, তুমি আমার বন্ধু হবে?

আমরা অনেক আগেই একে অপরের বন্ধু হয়ে গেছি। আর আজকের সকালের ঘটনাটা তারই বহিঃপ্রকাশ। আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে দিলাম। সৌভাগ্যবশত হরতাল হওয়ায় এ ঘটনার দুই দিন পর অফিসে যাইনি।

আমার মা আর তার স্বামী বাসা থেকে বের হওয়ার পরই সে আমাদের রুমে আসে। আমি বিছানায় শোয়া ছিলাম। সে আমার পাশে বসে কথা বলছিল আর মাঝে মধ্যে আমাকে চিমটি কাটছিল। এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠে দরজাটা বন্ধ করে তাকে জড়িয়ে ধরি এবং তার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করি। লিপির পর্বত শৃঙ্গগুলো আলতোভাবে স্পর্শ করি। সে এক ভিন্ন স্বাদের অনুভূতি। কিছুক্ষণ পর আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে লিপি বলে, এভাবে দরজা আটকালে মানুষ সন্দেহ করবে। দরজা খুলে দাও। বাধ্য হয়ে খুলে দিলাম। সারা দিনে অজস্র বার তার পর্বতগুলো স্পর্শ করি আর অজস্র চুম্বন তার ঠোটে আকি। শেষ বিদায়ের সময় বললো, শোন, একটি জিনিস ছাড়া আমার সব কিছুতে তোমাকে অধিকার দিলাম। তবে সেই জিনিসটা কখনো চাইবে না। আমিও একটু ঘুরিয়ে বললাম, জোর করবো না। তবে স্বেচ্ছায় দিলে নেবো। লিপি বললো, দেখা যাবে। তারপর সেদিনের মতো চলে গেল।

রাতে একটুও ঘুমাতে পারলাম না। শুধু একটাই ভাবনা – প্রতিশোধ নাও, অপমানের প্রতিশোধ। পরদিন সকালে লিপি বললো, গত রাতে তোমার দরজায় হাত দিয়েছিলাম, দেখি বন্ধ। আমি কিছুই বললাম না, শুধু হাসলাম। তারপর থেকে রাতে দরজা খোলা রাখি আর অপেক্ষায় থাকি।

তিন দিন পর হঠাৎ মাঝ রাতে ঘুম ভাঙলো। অনুভব করি আমার শরীর জড়িয়ে শুয়ে আছে লিপি।

কখন এসেছ?

কিছুক্ষণ আগে।

তোমার পতি?

সে চিন্তা আমার, তোমার নয়। আচ্ছা, তুমি দরজা খোলা রাখলে কেন?

তুমি আসবে তাই। আমি জানতাম তুমি আসবে।

জানবেই যখন তাহলে ঘুমিয়ে পড়লে কেন? কোনো কথা না বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর তার ওষ্ঠদ্বয়ের উষ্ণতা পরীক্ষা করতে লাগলাম। লিপিও নিজের শরীরের সঙ্গে আমাকে পিষে নিজের উষ্ণতা প্রকাশ করলো। কিছুক্ষণ পর উঠে চলে গেল, সুযোগ পেয়েও চরম মুহূর্তে পৌছাতে না পেরে নিজেকে ধিক্কার দিলাম আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম।

দুইদিন পর মাঝরাতে আবার এলে দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। চুমোয় চুমোয় তাকে উত্তপ্ত করে তার চন্দ্রমন তারামন পর্বতমালার ভূ–তাত্ত্বিক গঠন অনুসন্ধান শুরু করলাম। মৃদু উত্তেজনায় যখন তার আবরণ সরাতে গেলাম সে মৃদু আপত্তি করলো। কিছুক্ষণ পরে নিজে থেকে আমাকে সাহায্য করলো। তখন লিপি আর সেই লিপি নেই। এখন সে উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি। গিরিপথে স্পর্শ করতেই বুঝলাম লাভা বিচ্যুতির জন্য প্রস্তুত। আমিও অস্থির হয়ে উঠলাম। দুজনেই ভিন্ন পৃথিবীর পথে রওনা দিলাম – যেখানে আবেগ, সুখ আর তৃপ্তির আকর্ষণ, যার কাছে পাঠশালায় পঠিত চুম্বকত্বের আকর্ষণ বিপরীত বাহুর বিকর্ষণ সূত্রটি অযৌক্তিক মনে হলো। এক সময় ঝড় থামলো। শান্ত হয়ে অনুভব করলাম ঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত

অথচ উষ্ণ কাশবন। শুধু ঠোট ফাক করে অস্পষ্ট স্বরে আমার কানে হালকা কামড় দিয়ে বললো, আশরাফ ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দাও। অবশেষে তৃপ্তির পূর্ণতা নিয়ে সেদিনের মতো চলে গেল। আর এভাবেই মাঝ রাতের ঝড়ের মাধ্যমে অতিবাহিত হচ্ছিল সুখের দিনগুলো।

সুখ নাকি দীর্ঘায়িত হয় না, তাই হয়তো ছয় মাসের মাথায় তার স্বামীর হাতে ধরা পড়ে গেলাম। তবে ভাগ্য ভালো হওয়ায় হাতেনাতে ধরা পড়িনি, শুধু সন্দেহের শিকার হয়েছি। তবুও নানা প্রকার পরীক্ষা ও নির্যাতনের পর লিপি বিচ্যুত হয়নি। আমিও নিজেকে ফেরাতে পারিনি। হয়তো তা সম্ভব নয়, আবার সম্ভব।

এখনো সময় সুযোগ মতো কাছাকাছি আসি, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই। এখন আর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নয়, সত্যিকারের ভালোবাসার টানে। যে ভালোবাসায় ন্যূনতম প্রতারণা কিংবা স্বার্থপরতা নেই, আছে শুধু আশা আর আশা।

লিপি আমার কাছে একটি সন্তান চেয়েছে। বলেছি যেদিন তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাব সেদিন দিয়ে যাবো। তবে নেয়ার দায়িত্ব তোমার। দুইজনে নানান স্বপ্নের বাসা বুনি। প্রায়ই লিপি আমার বুকে মাথা রেখে বলে, আশরাফ, তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো দূরে বহু দূরে, যেখানে আমাদের অতীত বর্তমান কেউ জানে না। প্রয়োজনে তোমাকে নিয়ে নৌকায় বাস করবো। আর তখনই বুকের ক্ষত শুকিয়ে যায়। আমাকে ভালোবাসার অপরাধে যে নিজের বোনকে কেটে টুকরো করে নদীতে ভাসাতে চেয়েছিল আজ সেই আমাকে নিয়ে ভাসতে চায়। এরই নাম কি ভালোবাসা?

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

হানিমুন

বুলা দাস

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেই মনে হলো, ইস! আজ সকালটা যদি এক লাফে সকাল হয়ে যেতো, তবে তো দারুণ হতো। আজই তার দেখা পেতাম! আজই তার আসার কথা। কতোদিন দেখা হয় না। দিদির বাসায় বেড়াতে সেই কবে এসেছি পটুয়াখালী। প্রতিদিন রাতে মোবাইলে কথা বলে মন ভরেনি। একটু সময়ের মধ্যে ইউনিটগুলো ফুরিয়ে যায় কিন্তু কথা যে শেষ হয় না।

চোখের পলকে আজ কাল হয়ে গেল। আমার প্রিয় মানুষ এলো। অনেক দিন পরে দেখা। লজ্জা লাগছিল ভীষণ। পাশে এসে দাড়ালো। সবার অলক্ষ্যে একটু চিমটি কাটলো। তাকাতে পারছিলাম না লজ্জায়। দুজনে তো আহ্লাদে আটখানা! কারণ আমরা যে কুয়াকাটা যাচ্ছি। হানিমুনে। বিয়ের পর হানিমুনে যেতে পারিনি বলে মনের দুঃখে কতো কেদেছি, রাগ করেছি।

বিয়ের প্রথমে আমরা বরিশাল পল্লী বিদ্যুতে ছিলাম। ক্যাম্পাসের সামনেই ছিল পটুয়াখালী কুয়াকাটা যাওয়ার রাস্তা। সিজনাল টাইমে বিশেষ করে শীতের শেষে কিংবা শুরুতে পর্যটকের গাড়ি অনেক রাতে গান বাজাতে বাজাতে যেতো। তখন আমার কান্না আসতো। আজ সে স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে ভেবে ভীষণ আনন্দে মনে দোলা লাগলো।

সব বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে পরদিনই আমরা কুয়াকাটার উদ্দেশে রওনা হলাম। খুশিতে মনটা ভরে যাচ্ছিল। ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছিলাম বার বার। সেখানে পৌছে আমরা হোটেল পর্যটনে উঠি। বেশ ভালো জায়গা। আগস্ট মাস বিধায় সময়টা অসময় ছিল বলে কোলাহলমুক্ত, নীরব।

বিকেলে আমরা ঘুরতে বের হলাম। সূর্যাস্ত দেখতে সি-বিচে গেলাম। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পুরোটা দেখা যায়নি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। সমুদ্র ভীষণ তর্জন গর্জন শুরু করলো। আমরা বার্মিজ মার্কেটগুলোতে ঘুরে ঘুরে গিফট কিনলাম। রাতে আবার হোটেল পর্যটনে ফিরে এলাম। রুমের সামনে বসে সমুদ্রের সেই গর্জন শোনা যাচ্ছিল। আমরা তাই কান পেতে সেই শব্দ শুনলাম।

সকালে সি-বিচে গিয়ে দেখি সমুদ্রের অন্য চেহারা, গতকাল যেখানে হেটেছি সেখানে পানি আর পানি। আবহাওয়া ভালো নয় বলে সূর্যাস্ত ভালো দেখা যায়নি। তাই একটু দেরিতে এসেছি আমরা। সমুদ্রের পাড় একটু একটু করে ভরে যাচ্ছিল। আর আমরা মোটরসাইকেলে করে পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। নারিকেল বাগান, শুটকির ঘের ছাড়িয়ে অনেক দূর গিয়েছি। পানিতে পা ডুবিয়ে ছবি তুলেছি। সি-বিচে গর্তে লুকিয়ে থাকা কাকড়াগুলো বেরিয়ে এলেই পেছনে পেছনে দৌড়িয়েছি। ঝিনুক কুড়িয়ে আচল ভরেছি। এভাবেই কেটেছে আমাদের বিয়ের পর প্রথম হানিমুন। হঠাৎ হানিমুন।

বাংলাবাজার, ভোলা থেকে

নিঃসঙ্গ

জাহাঙ্গীর আকরাম কাজল

যমুনার বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া স্টিমারের রেলিং ধরে দাড়িয়ে আছি। সংগ্রামী জীবনের কর্মময় দিনগুলো থেকে আপাত বিদায় নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে একরাশ ব্যর্থতার গ্লানি ও এক বুক ব্যথাকে সঙ্গী করে। ভেঙে যাওয়া ঢেউয়ের ওপর জ্যোৎস্নার আলোর কাপন আনমনা করে দিচ্ছে বার বার। জীবন খাতার হিসাব মেলাতে পারছি না কিছুতেই।

অথচ এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না!

বিত্তহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি। সামর্থের সীমাবদ্ধতা থাকলেও স্বপ্নের সীমানা ছিল না। পড়া আর খেলার অবসরে ঘাসের গালিচায় শুয়ে তাকিয়ে থাকতাম নিঃসীম আকাশের দিকে। ইচ্ছা হতো মেঘের মতো আকাশের প্রান্ত ছুয়ে ভেসে বেড়াতে। স্বপ্ন দেখতাম বড় হয়ে বৈমানিক হবো। জাতীয় পতাকা নিয়ে ছুটে যাবো দেশ থেকে দেশান্তরে।

কিন্তু আর্থিক দৈন্যে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে গেল। বৃত্তির টাকার সঙ্গে টিউশনি করে লেখাপড়াটা শেষ করলাম কোনো মতে। পরীক্ষার ফলের আগেই চাকরিও পেয়ে গেলাম। বিদেশি প্রতিষ্ঠানে এক্সিকিউটিভ। মন্দ কি! ভাবলাম, এবার জীবনটাকে সাজিয়ে নেয়ার পালা। ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরা, উৎকণ্ঠিত আর প্রতীক্ষিত আচলের শ্রান্তি মুছে দেয়ার পরশ! ভালোবাসার নির্যাসে গড়া ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে আসা স্নেহের বন্ধন! কিছুটা দায়িত্ব আর একটু কর্তব্য! নতুন করে স্বপ্ন দেখলাম আবার। আনমনেই গুনগুন করলাম,

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয় মান নয়, ছোট একটি বাসা
মনে ছিল আশা!

মায়ের চিঠি পেয়ে বাড়িতে ছুটতে হলো। বাবা অসুস্থ। চিকিৎসা এবং সংসারের দায়িত্ব। স্বপ্নের চেয়ে বাস্তবতার দাবি অনেক বেশি। সামলে নিলাম এক সময়। দায়িত্ব আর কর্তব্যের মাঝেও ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিলাম নিজেকে।

এক বিয়ের অনুষ্ঠানে মিষ্টি মেয়েটিকে দেখেই ভালো লেগে গেল। নামও জানলাম, মিতা। বন্ধুর দূর সম্পর্কের শ্যালিকা।

ভাবী, মিতাকে একটু মধুমিতা নামে ডাকতে পারি! দুষ্টুমি করে বললাম বন্ধুর বউকে।

যদি ম্যানেজ করতে পারেন! হেসে বললেন তিনি।

কাল বিকেলে আসছি আপনার বাসায়, ক্যামেরা নিয়ে।

মিতা, রিনিঝিনি সুরে কি আমার ঘুম ভাঙাবে? ছবি তোলার ফাকে প্রশ্ন করলাম।

ভাঙাতে পারি, যদি দুহাত ভরা রেশমি চুড়ি পাই আনত নয়নে সলাজ হেসে বললো।

টেলিফোনে কথার মালা গেথে কেটে গেল কয়েকটা দিন।

ছবিগুলো পৃন্ট করেই বাড়ি ছুটলাম। সবাই পছন্দ করলো তার ছবি। বাবা–মাকে নিয়ে ঢাকায় ফিরলাম। চললো আংটি পরানোর আয়োজন। এর মাঝেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন বাবা। অপারেশন করাতে হলো। উৎকণ্ঠায় কেটে গেল তিনটি মাস! হঠাৎ করেই বিয়ে হয়ে গেল মিতার। রেশমি চুড়ি আর কেনা হলো না।

আশা আর নিরাশার মাঝে ক্ষতবিক্ষত হলাম। সকাল সন্ধ্যার বাধাধরা জীবনে হাপিয়ে উঠলাম। চাকরিটা ছেড়ে দিলাম এক সময়। ব্যবসা শুরু করলাম। কাজের মাঝে ভুলে থাকতে চাইলাম সবকিছু।

এক বিকেলে অফিসের কাজে ব্যস্ত। টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

হ্যালো, কে বলছেন?

আমাকে আপনি চিনবেন না। অপর প্রান্তের উচ্ছল উত্তর!

দেখুন অচেনা কারো সঙ্গে আমি কথা বলি না!

আমি কিন্তু আপনাকে চিনি!

আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?

পারেন, তবে এখন নয়।

আমাকে এখন রাখতে হচ্ছে। সরি!

পরিচয়টা পেলাম কয়েকদিন পরেই। মুক্তা। আমার পাশের বাসায় থাকে। খুব সুন্দরী। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। মাঝে মধ্যেই টেলিফোন করে। কাজ থেকে জোর করে নেয়া এই অবসর মন্দ লাগে না। দিনে দিনে বাড়তে থাকে টেলিফোন, বাড়তে থাকে ভালো লাগা। ভালো লাগায় কখন যে ভালোবাসার পরশ লেগেছে বুঝতেই পারিনি।

মুক্তা, ঝিনুকের মতোই তোমাকে বুকের মাঝে রাখতে চাই। বললাম একদিন, *আমি আর দেরি করতে চাই না।*

সাগর, আর কটা দিন ধৈর্য ধরো, প্লিজ! ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ হোক।

তোমাকে আমি হারাতে চাই না মুক্তা।

তোমার হারানোর কিছু নেই, আমি শুধুই তোমার।

একদিন সকালে হঠাৎ অফিসে এসে হাজির হলো মুক্তা! কিছুটা বিধ্বস্ত। অজানা আশংকায় চমকে উঠলাম! কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। বললো, সাগর, আমায় ক্ষমা করো! আমি কথা রাখতে পারলাম না। দেখতে এসে বিয়ে, চাপের মুখে মেনে নিতে হয়েছে আমাকে!

তীব্র এক অচেনা ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার কি কিছুই চাইতে নেই? শুধু হারানোই আমার নিয়তি? ঝাপসা চোখে শুধু বললাম, *সুখে থেকো।* মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল।

তিলে তিলে গড়ে তোলা স্বপ্নের সৌধ ভেঙে তছনছ হয়ে গেল আবার। মানুষের প্রতি, জীবনের সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম! নিদ্রাহীন রাতে ব্যথিত স্মৃতিগুলোকে ভাসিয়ে দিতে চাইলাম হুইস্কি ওয়াইনের প্লাবনে। সিগারেটের ধোয়ায় আচ্ছন্ন করতে চাইলাম সব অনুভূতি। ভাঙা মনের ভার আর সইতে পারলো না শরীর। অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বিছানায় থাকতে হলো দীর্ঘ দিন। সযতনে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটিও বন্ধ করে দিতে হলো এক সময়। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে হয়ে গেলাম বিধ্বস্ত।

ভাগ্যের এই বিপর্যয়ে একদিন পাশে এসে দাড়ালো কান্তা, এক সময়ের সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী। শোনালো সান্ত্বনার বাণী! সাহস জোগালো নতুন করে জীবনকে শুরু করার। আশ্বাস দিল সব সংগ্রামে ভালোবাসার ডালি নিয়ে পাশে থাকার।

আবার ভালোবাসা! অবিশ্বাসের ম্লান হাসি হাসলাম। বললাম, কান্তা, তুমি আমার জীবনের সব কথাই তো জানো, তবুও কেন প্রলোভন দেখাচ্ছো? বন্ধু হিসেবে পাশে থাকতে চাও থাকো। কিন্তু ভালোবাসার গল্প আর আমাকে শুনিও না, প্লিজ! আমার জীবনটা হচ্ছে সেই উদাস পথিকের, পথই যার শেষ ঠিকানা!

প্রিয় কবিতাটি শুনালাম তাকে...

উদাস পথিক ভাবে,
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে,
উদাস পথিক ভাবে।
ঘরে এসো, সন্ধ্যা সভায় ডাকে,
নয় তোরে নয় বলে একা তাকে,
পথের পথিক পথেই বসে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চাবে,
উদাস পথিক ভাবে!

আমি প্রমাণ করবো ভালোবাসা বার বার আসে, ভালোবাসা চিরন্তন! দৃঢ় স্বরে বললো কান্তা।

যদি সত্যিই সেদিন আসে তবে যোগ্য প্রতিদান পাবে তুমি।

কান্তার প্রেরণা নতুন করে বাচার স্বপ্ন দেখালো আমাকে। শুরু হলো ধ্বংসের মাঝেও সৃষ্টির সংগ্রাম। এ লড়াইয়ের শুরু আছে, শেষ অনেকটা দূরাগত। কান্তা শেষ পর্যন্ত পারলো না নিজেকে ধরে রাখতে। অনিশ্চিত যাত্রার চেয়ে নিশ্চিত ঘরের আহ্বান তাকে নিয়ে গেল অন্যের বাহুবন্ধনে!

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো নিরবচ্ছিন্ন আঘাত! পারলাম না নিজেকে ধরে রাখতে! সবকিছু ছেড়ে ফিরে চললাম শৈশবে ফেলে আসা সেই পথে, সাফল্য–ব্যর্থতা, পাওয়া আর হারানো নিঃসঙ্গ ভালোবাসার যন্ত্রণাবিদ্ধ স্মৃতি নিয়ে। পথই যে আমার শেষ ঠিকানা! জানি না ঘরের আহ্বান আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে কি না! আজ মনে হচ্ছে,

I am the quest of no one
At the end of my life
The long time is before me
But I am tired.

হুইসলের শব্দে সংবিৎ ফিরে এলো। ঘাটে ভিড়ছে স্টিমার। নেমে এলাম ধীরে ধীরে। নিঃসঙ্গ পথিক হয়ে আবারো পা বাড়ালাম অনিশ্চিত গন্তব্যে।

ঢাকা থেকে
pulse@citechco.net